বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী

বিজ্ঞানকর্মী সংস্থা প্রকাশিত

ষষ্ঠ বর্ষ ঃ পঞ্চম সংখ্যা

বসু বিজ্ঞান মন্দির কি কারও জমিদারী ?

একটি গবেষণা-প্রতিষ্ঠান কেমনভাবে কর্তৃপক্ষের খামখেয়ালীর শিকার হয়ে পড়ে তার জলন্ত উদাহরণ বসু বিজ্ঞান মন্দির। দীর্ঘদিন ধরে এই গবেষণাগারে বিরোধ চলছে (বি ও বি জানু-ফেব্রু ও সেপ্টে-অক্টো 1982 দ্রঃ)। আপাতদৃষ্টিতে বিরোধ হ'ল প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের (মূলত ডিরেক্টর ও রেজিষ্ট্রার) সঙ্গে সর্বস্তরের কর্মীদের একমাত্র সংগঠন বসু বিজ্ঞান মন্দির কর্মী সমিতির। বিগত আট মাস ধরে এই সমিতির সম্পাদকসহ ছ জনকে সাসপেণ্ড করে রাখা হয়েছে। উচ্চপদস্থ বিজ্ঞানীরা ও বিভাগীয় প্রধানরা বার বার আলোচনার মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তির অনুরোধ করা সত্ত্বেও রেজিষ্ট্রার-ডিরেক্টর-চক্র উদাসীন। পরিচালন সমিতির (কাউন্সিল) সভা দীর্ঘদিন ডাকা হয়নি। এমনকি কাউন্সিল কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী একজনের একটি অনুসন্ধান কমিটি শুধু যে তৈরীই হয়নি তা নয়, সমিতির অভিযোগ, কাউন্সিলের সভার কার্যবিবরণী পাল্টানোর চেষ্টাও চলছে! কর্মী সমিতির আরও অভিযোগ বর্তমান রেজিষ্ট্রার ও ডিরেক্টর গবেষণার উন্নতির তোয়াক্কা না করে নিজ নিজ অফিস কর্মচারীর সংখ্যা বাড়িয়ে চলেছেন, রেজিষ্ট্রারের আত্মীয় বন্ধুদের অবৈধভাবে চাকুরী ও ঠিকাদারীর কাজ দেওয়া হয়েছে—ইত্যাদি।

উল্লেখযোগ্য যে বর্তমান ডিরেক্টর ও রেজিষ্ট্রার দুজনেই অন্য প্রতিষ্ঠানে আজীবন কাজ করে অবসর গ্রহণের পর এখানে যোগ দিয়েছেন। মনে হয় এই প্রতিষ্ঠানের উন্নতিতে তাঁদের কোন আগ্রহ নেই। এমনকি একটি সুপ্রতিষ্ঠিত চালু গবেষণাগারকে পরিচালনার ব্যাপারেও তাঁরা পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছেন। যে সব গুরুতর অভিযোগের কথা উঠেছে তাতে তাঁদের অবিলম্বে বিদায় দিয়ে একটি সার্বিক এবং নিরপেক্ষ তদন্তের ব্যবস্থা অবিলম্বে হওয়া উচিত।

স্কুলে স্বাস্থ্য প্রকল্প

আত্মবিশ্বাসী স্বাস্থ্য কর্মী

নোবেল পুরস্কারের বিকল্প

মার্চ-এপ্রিল 1983

1 টাকা

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞান কর্মী

ষষ্ঠ বর্ষ : পঞ্চম সংখ্যা

মার্চ-এপ্রিল 1983

এ সংখ্যায় আছে

সম্পাদকীয়

স্কুল-স্বাস্থ্য প্রকল্প—সুখময় ভট্টাচার্য

আত্মবিশ্বাসী মানুষ সন্ধানে—রবীন চক্রবর্তী

বিকল্প নোবেল পুরস্কার—গৌতম ব্যানার্জী

পরিক্রমা

খবর

পুস্তক পর্যালোচনা

চিঠিপত্র

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞান কর্মী

সম্পাদকমণ্ডলী

রবীন মজুমদার (প্রধান)

রবীন চক্রবর্তী

অভিজিৎ লাহিড়ী

অসীম চট্টোপাধ্যায়

সৌমেন গুহ

পড়ুন ও পড়ান ঃ

উৎস মানুষ

প্রগতি বার্তা

বিজ্ঞান মণীষা

'বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী' পত্রিকার কিছু পুরোনো সংখ্যা এখনো পাওয়া যাচ্ছে।

আমাদের তৈরী কিছু স্লাইড, সেট জনবোধ্য অনুষ্ঠানের জন্য পাওয়া যাবে।

যেমন—বনৌষধি
বন্যা
সূর্যগ্রহণ
নিউক্লিয়ার বিপদ
জল ও স্বাস্থ্য
দৈনন্দিন জীবনে বলবিদ্যা

যৎসামান্য আর্থিক সাহায্যের বিনিময়ে স্লাইড-সেট ও স্লাইড প্রজেক্টার যে কোনো সংগঠন ব্যবহারের জন্য নিতে পারে।

যোগাযোগ ঃ—

রবীন চক্রবর্তী

ফলিত পদার্থবিদ্যা বিভাগ, বিজ্ঞান কলেজ, রাজাবাজার

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী

ষষ্ঠ বর্ষ ঃ পঞ্চম সংখ্যা

মার্চ-এপ্রিল 1983

সম্পাদকীয়

পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানকর্মী সংস্থার উদ্যোগে সাত বছর ধ'রে নিয়মিত প্রকাশিত হ'য়ে আসছে 'বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী'। সংখ্যার বিচারে অল্প হ'লেও, নিয়মিত পাঠক আর লেখকগোষ্ঠী গ'ড়ে উঠছে 'বি-ও-বি' কে ঘিরে। কিন্তু সামগ্রিক বিচারে, স্বীকার করতেই হবে, 'বি-ও-বি'র আবেদন ক্রমশ প্রসারিত হ'চ্ছে না বিস্তৃত ক্ষেত্রে, স্বতঃস্ফূর্ত সাড়া জাগাচ্ছে না বিজ্ঞানকর্মী আর মানুষের ব্যাপকতর অংশের মনে। সন্দেহ নেই, এর জন্য দায়ী বি-ও-বি তথা পঃ বঙ্গ বিজ্ঞানকর্মী সংস্থার নিজস্ব কিছু দুর্বলতা। তবে সামগ্রিকভাবে এ রাজ্যে বিজ্ঞান আন্দোলনের অগোছালো বিক্ষিপ্ত অবস্থাটাও ভাববার মত। কেরল, কর্ণাটক, মহারাষ্ট্রে বিজ্ঞান আন্দোলন একটা বিরাট কিছু ব্যাপার না হ'লেও পশ্চিম বাংলার চাইতে বেশী সজীব, সুসংহত, উদ্দেশ্যপূর্ণ। আমাদের এখানে বিজ্ঞান আন্দোলনের কর্মীদের আল্‌গা, ঢিলেঢালা ভাব, স্পষ্ট একটা তাগিদের অভাব, নানারকম রাজনৈতিক সংশয়বোধ, বিজ্ঞানের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত কর্মীদের উদাসীনতা—সব মিলে আন্দোলনে প্রাণের সঞ্চার হয় নি এখনো। তবে বিজ্ঞান আন্দোলনের চাহিদা যে নেই তা নয়। গত কয়েক বছরে ছোট বড় নানান সংগঠন যে যেভাবে বুঝছে নানান ধরনের চর্চায় সামিল হ'চ্ছে। মানুষের উৎসাহ আর সমর্থনও মিলছে এই সমস্ত চর্চায় আর প্রচেষ্টায়। বৈজ্ঞানিক মানসিকতা গড়ার দিকে লক্ষ্য রেখে পোস্টার, স্লাইড, চলচ্চিত্র তৈরী; বিজ্ঞান-মেলা সংগঠন; ধর্মীয় সমাবেশের পাশাপাশি বিজ্ঞান-প্রদর্শনীর মণ্ডপ খোলা; লৌকিক সংস্কার, বিজ্ঞান-চর্চা, চিন্তা-ভাবনা নিয়ে নানান সমীক্ষা; যুক্তিবাদী মানসিকতা বিকাশের চেষ্টায় ছোটবড় বহু পত্রিকা, পুস্তিকা, বই প্রকাশ; জনস্বাস্থ্য কেন্দ্র সংগঠন, বিজ্ঞান ও সমাজ বিষয়ে পাঠাগার ও তথ্যকেন্দ্র সংগঠন; গ্রামে গ্রামে 'বিজ্ঞান পদযাত্রা' নিয়ে যাওয়া; এরকম বহু বিভিন্ন ধরণের কাজকর্ম শুরু হ'য়েছে এখানে ওখানে নানান জায়গায় নানান ভাবে। আলাদা ক'রে দেখলে প্রতিটি কাজের পরিসর যথেষ্ট ক্ষুদ্র, কিন্তু সবগুলোকে মিলিয়ে দেখলে ব্যাপক সংখ্যক মানুষের ভিতরকার অস্পষ্ট একটা চাহিদা আর তাগিদ টের পাওয়া যায়। কিন্তু মুশকিল হ'চ্ছে, এখনো এসব কাজকর্ম কোনো একটা সমন্বিত রূপ নেয় নি, জনজীবনে প্রভাব ফেলার মত অবস্থায় আসে নি। এই সমন্বিত করার কাজটা বিজ্ঞান আন্দোলনের বড় দায়িত্ব। সেটা এ রাজ্যে এখনো ঠিকমত শুরু হ'তে পারছে না নানা কারণে। তবে এ ব্যর্থতার ভিতরও ভালো দিক একটা আছে—তড়িঘড়ি কোনো সমন্বয়ের চেষ্টা হ'লে সেটা ওপর থেকে চাপানো একটা ব্যাপারে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী। মানুষের চিন্তাভাবনা কাজকর্মের স্বতঃস্ফূর্ত সজীবতা ক্ষুণ্ণ না করে যে সমন্বয়, সেটাই হবে সঠিক সমন্বয়।

বিজ্ঞান আন্দোলনের কাজে বি-ও-বি তার ক্ষুদ্র সামর্থ্য নিয়োগ করতে আগ্রহী। বিজ্ঞানের সামাজিক ভূমিকা প্রসঙ্গে আলোচনা ও মতামত প্রকাশের মঞ্চ হ'তে পারে এই পত্রিকা। এ ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানকর্মী সংস্থার বা পত্রিকার সংগঠনের নিজস্ব যে সব ত্রুটি ও দুর্বলতা সেগুলি কাটিয়ে উঠতে চাই বন্ধুস্থানীয় সকলের সাহায্য-সমালোচনা-পরামর্শ। বিজ্ঞান আন্দোলন যাঁরা চান, তাঁদের কাছে এটা আমাদের অনুরোধ নয়—দাবী।

বর্তমান সংখ্যাটিতে স্বাস্থ্যবিষয়ক লেখার প্রাধান্য ঘটে গেল। বিজ্ঞান আন্দোলন প্রসঙ্গে উপরে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে। জনস্বাস্থ্যের বিষয়টিকেও এর অন্তর্ভুক্ত মনে করা যেতে পারে। বস্তুত বিজ্ঞান আন্দোলন গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যবিষয়ক জনমুখী কর্মসূচীর গুরুত্ব অপরিসীম, বহু ক্ষেত্রে তা বাস্তবে প্রমাণিতও। সরকারী ও বেসরকারী ক্ষেত্রেই প্রথাগত ও অপ্রথাগত-ভাবে এধরনের কাজের বিস্তৃত ক্ষেত্র উন্মুক্ত; 'স্কুল স্বাস্থ্য প্রকল্প' ও 'আত্ম-বিশ্বাসী মানুষ সন্ধানে' রচনা দুটিতে তার ইঙ্গিত মিলবে।

স্কুল-স্বাস্থ্য প্রকল্প

সুখময় ভট্টাচার্য

প্রবন্ধের শিরোনামা দেখেই অনেক ভ্রু কুঞ্চিত হবে। আবাল্য 'ছাত্রানাং অধ্যয়নং তপঃ'—জেনে আসা সংশয়ী অভিভাবক বলবেন 'স্কুল তো লেখাপড়া শেখানর জন্য। অসুস্থ হলে দেখার জন্য আমরা আছি, ডাক্তারখানা হাসপাতাল আছে।' দেশনেতা সংখ্যাতত্ত্ব আউড়ে বলবেন '1981 সালের জনগণনায় দেখা গেছে ভারতে নিরক্ষর জনের সংখ্যা 42 কোটি 43 লক্ষ। সারা দেশে অ, আ, ক, খ শেখানর ব্যবস্থাই করা যাচ্ছে না স্বাধীনতার তিন দশক পরেও। এর ওপর স্কুলে স্বাস্থ্য-ব্যবস্থার প্রচলন করার প্রস্তাব টেকসই হবে?' ঝানু আমলা বিস্মিত প্রশ্ন রাখবেন 'স্কুল তো জানি শিক্ষা মন্ত্রকের অধীন, আর স্বাস্থ্য স্বাস্থ্যমন্ত্রকের। তা স্কুল-স্বাস্থ্য প্রকল্প বস্তুটি কোন মন্ত্রকের অধীন হবে? দেখভাল করবে কে, আর টাকাই বা আসবে কোন হেডে?' প্রশ্ন উঠবে এমনধারা আরও অনেক। এতে বিচলিত না হয়ে দেখা যাক আমাদের আলোচ্য প্রস্তাবটি প্রকৃতপক্ষে কি এবং তা ধোপে টেকে কি না।

ভারতে জনসংখ্যার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ পাঁচ থেকে পনের বছর বয়ঃসীমার। সমাজের স্বাভাবিক অবস্থায় ও ব্যবস্থায় এই এক-তৃতীয়াংশ জনসমষ্টিকে বলা যেত স্কুলগামী জনসমষ্টি। আর্থ-সামাজিক অব্যবস্থার ফলে এই বৃহৎ-সংখ্যক বালকবালিকার একটা বড় অংশই স্কুলমুখো হতে পারে না। এই রূঢ় বাস্তব চিত্র সত্ত্বেও ঘটনা এই যে এই বয়সী ছেলেমেয়েদের অন্য বড় অংশটি স্কুলে যায়। এবং এই স্কুলগামীর সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়বে, কারণ জনশিক্ষার সচেতনতা ও সেদিকে সরকারী প্রচেষ্টা ধীরে হলেও ক্রমশঃ বাড়ছে এবং বাড়তেই থাকবে। যে অংশটি স্কুলে যায়, তারা তাদের দিনে-রাতে জাগ্রত সময়ের প্রায় অর্ধেক অংশই কাটায় স্কুলে। প্রত্যহ এতটা সময় যেখানে কাটাতে হচ্ছে, সেখানকার পরিবেশ ইত্যাদি স্বাস্থ্যের পক্ষে অনুকূল কি না, শিক্ষার্থীদের বা তাদের শিক্ষকদের স্বাস্থ্য ইত্যাদি ঠিকঠাক আছে কিনা, এদিকগুলি কিছুটাও দেখতে পারলে আখেরে লাভ বই ক্ষতি নেই।

এই গেল এক বিবেচনা। অন্যটি হল, প্রত্যহ এই দীর্ঘ সময় ব্যয় করে আমাদের ছাত্রছাত্রীরা কামস্কাটকা কোথায় অবস্থিত, পরমাণুর গঠনবৈচিত্র্য প্রভৃতি প্রভূত এবং কঠিন কঠিন বিদ্যা আহরণ করে। কিন্তু কি করে একটি আকস্মিক দৈহিক বিপদের প্রতিবিধান করতে এগোতে হবে, কিংবা নিজের পরিবারের সাধ্যের মধ্যে কোন কোন খাবার থেকে পুষ্টিমূল্য বেশী পাওয়া যাবে, কিংবা বাড়ীতে কারুর কোন অসুখ হলে অন্য সকলের জন্য কি সাবধানতা নিতে হবে, কিংবা নিজের দেহের গঠন, বিশেষতঃ বয়ঃসন্ধির বিস্ময় ও সমস্যা সম্পর্কে এক স্পষ্ট ধারণা—এসব জ্ঞান কিন্তু তাদের দেওয়া হয় না। অথচ 'স্বাস্থ্যই সকল সুখের মূল' এটি আমাদের জীবনে প্রায়শঃ উচ্চারিত এক আপ্তবাক্য।

শারীরতাত্ত্বিক দিক থেকে বাল্য ও কৈশোর আমাদের জীবনে একটা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ কাল। এই সময় শরীরের বৃদ্ধি সবচেয়ে বেশী গতিতে চলে, পরিবেশের বিভিন্ন ঘটনা মনে প্রথম ঘাত-প্রতিঘাতের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করায়। বয়ঃসন্ধিকাল তার বিস্ময়, এবং উপযুক্ত শিক্ষার অভাবে অনেকক্ষেত্রে বিপর্যয়, নিয়ে আসে। কিশোর মনের বিকৃতি ও তার বিভিন্ন প্রকাশ এবং সমাজের ওপরে তার প্রভাব ইত্যাদি সম্পর্কে সংখ্যাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ চলে। বাড়ীতে ছেলেমেয়েদের সঙ্গে খোলাখুলি আলোচনা, বিশেষতঃ তাদের বয়ঃসন্ধির সমস্যা সম্পর্কে, প্রায়শই এক ট্যাবু। দৃশ্যগত অসুখ-বিসুখ হলে মাতাপিতা অবশ্যই সাধ্যমত চিকিৎসা করান। কিন্তু আধুনিক বিবেচনায় রোগ নিরাময় হচ্ছে স্বাস্থ্যের ঋণাত্মক দিক মাত্র। একটি কিশোর বা কিশোরী দৃশ্যগতভাবে অসুস্থ না হয়েও তার শরীর-মনের বৃদ্ধি ও পূর্ণতা বাধা পেতে পারে।

সমাজদেহের যে বিশেষ একটি প্রতিষ্ঠানে এইসব বালক বালিকা, কিশোর-কিশোরীকে একত্র পাওয়া যাচ্ছে, এবং ক্রমে আরও পাবে, তা হল স্কুল। এবং তাদের পাওয়া যাচ্ছে প্রত্যহ অনেকটা সময় ধরে। তাদের শরীর মনের পর্যবেক্ষণ, এবং ক্ষেত্রবিশেষে অভিভাবকের সহযোগিতায় প্রতিবিধান, কি এইসব প্রতিষ্ঠান থেকে সুষ্ঠুভাবে সুরু করা চলে না? চলে না কি এইসব কিশোর কিশোরীকে ব্যক্তিগত ও পারিবারিক স্বাস্থ্য সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞাতব্য তথ্যগুলি জানতে দেওয়া? অনেক কিশোরীর কাছেই স্কুল জীবন সাংগ হওয়ার পরেই আসে বিবাহিত জীবনের পর্ব এবং সন্তানধারণ ও পালন ইত্যাদি প্রক্রিয়ার পালা। স্কুল জীবনের শেষের পর্যায়ে কি এই ভবিষ্যৎ ভূমিকার কিঞ্চিৎ পূর্বপ্রস্তুতি তাদের দেওয়া উচিত বা সম্ভব নয়?

এসব তো আছেই। তাছাড়া, আমাদের দেশে, বিশেষতঃ গ্রামাঞ্চলে, অনেক ছাত্রই তার পরিবারে প্রথম স্কুলে যাচ্ছে। সেখান থেকে তারা বিভিন্ন বিষয়ে প্রাপ্ত বিচিত্র তথ্য বহন করে নিয়ে যায় তাদের গৃহের পরিবেশে। ঐসব পরিবারে লেখাপড়া শেখা ঐ ছেলেদের গুরুত্ব ও প্রভাব উপেক্ষণীয় নয়। তারা স্কুলে তাদের নবলব্ধ অভিজ্ঞতা অনেকক্ষেত্রে গৃহে তাদের বয়স্ক জনের সঙ্গে ভাগ করে নেয়। স্কুলে যথার্থ ও ব্যবহারিক স্বাস্থ্য শিক্ষার প্রবর্তন করলে এই অভিজ্ঞতা কি বাহিত হয়ে যাবে না অসংখ্য গৃহে গৃহান্তরে? জনস্বাস্থ্যের ব্যাপকতর প্রচেষ্টায় তা কি কাঠবেড়ালীর প্রচেষ্টার সমতুল্যও হবে না? শিক্ষাকে যদি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের ওপর বিনিয়োগ বলে ধরা হয়, কোন

বিষয় বা বৃত্তিতে ব্যুৎপত্তি লাভের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার্থীরা সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হলে এবং তারা স্বাস্থ্য সম্পর্কে কতকগুলি প্রাথমিক জ্ঞাতব্য জানলে কি সেই বিনিয়োগ অধিকতর ফলদায়ী হবে না? স্কুলে দ্বিপ্রাহরিক আহারদানে যে লক্ষ্যের অভিপ্সা, তার আরও ব্যাপ্তি কি আমাদের প্রাপ্তির পাল্লাটা ভারী করবে না?

এই প্রস্তাবিত স্বাস্থ্য প্রকল্প হবে দ্বিমুখী। প্রথম, স্কুলে স্বাস্থ্য ব্যবস্থার প্রবর্তন (School health service)। এতে থাকবে শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের স্বাস্থ্যের তত্ত্বাবধান এবং বিদ্যালয়ের পরিবেশের সমস্যাগুলির প্রতিবিধান। দ্বিতীয়, স্বাস্থ্য চর্চার প্রাথমিক জ্ঞাতব্য বিষয়গুলির তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক দিক সম্পর্কে ছাত্র-ছাত্রীদের শেখান (health education)।

শিশুর-থেকে-শিশুতে Child-to-Child

1979 সালে আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষে শুরু হয়েছে নতুন এক কর্মসূচী। নাম দেওয়া হয়েছে—CHILD-to-Child বা আমাদের ভাষায় বলা যায় শিশুর থেকে শিশুতে। এর উদ্দেশ্য হ'ল বিদ্যালয় স্তরের ছেলে মেয়েদের স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বিষয়ে এমনভাবে শিক্ষিত করে তোলা যাতে এরা পরিবারের গণ্ডীতে তাদের ভাই-বোনেদের দেখাশোনার ব্যাপারে এই শিক্ষা কাজে লাগাতে পারে। বিভিন্ন দেশের স্বাস্থ্য ও শিক্ষাকর্মীদের নিয়ে গঠিত একটি আন্তর্জাতিক দল এ সম্পর্কে কিছু পাঠ-নির্দেশ তৈরী করেছেন। এর বিষয়-সূচীতে আছে :—

শিশুর আহার ঠিক-ঠাক হচ্ছে কিনা বুঝব বিভাবে * শিশু-উপযোগী খাদ্য * পেটের অসুখে কি করণীয় * দুর্ঘটনার ঘটনায় * মনোমত প্রতিবেশী * দেখিতো ভাই-বোনেরা কেমন দেখতে ও শুনতে পায় * চোখের যত্ন * দাঁত থাকতে দাঁতের মর্যাদা বোঝা * স্বাস্থ্য-সমীক্ষক দল * খেলার সাথী ভাই-বোনেরা * শিশু উপযোগী খেল্‌না ও খেলা * খেলতে চাই সুস্থ পরিবেশ * শিশুর জন্য রঙ্গমঞ্চ এবং কিছু গল্প * প্রতিবন্ধী শিশুর পাশে দাঁড়াতে * শিশুর কাছাকাছি * অসুস্থতার পূর্বলক্ষণ * অসুস্থকে দেখতে হলে * স্বাস্থ্যসম্মত অভ্যাস।

এ সম্পর্কে জানতে এবং পাঠসমূহ সংগ্রহ করতে নীচের ঠিকানায় যোগাযোগ করুন :

Teaching Aid at Low Cost (TALC), Institute of Child Health, 30 Guilford Street, London WC IN 1EH England.

এর গোটা আটেক বিষয় নিয়ে একটি সংকলন প্রকাশিত হয়েছে। সেটাও সংগ্রহ করা যেতে পারে।

CHILD-to-Child, by Aarons & Howes, Macmillan Press England.

বিভিন্ন সরকারী প্রাথমিক, মাধ্যমিক বা উচ্চমাধ্যমিক স্কুল তো দূর কথা, অনেক নামী দামী স্কুলে যেখানে উচ্চ বেতন ও লেখাপড়ার পর্যাপ্ত আয়োজন, সেখানেও শিক্ষার্থী-শিক্ষকদের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা বলতে প্রায় কোন ব্যবস্থা বা ধারণা নেই। তবে এসব স্কুল সংখ্যায় অল্প এবং এখানে যারা পড়তে আসে তারা আর্থিক দিক থেকে স্বচ্ছল পরিবারের সন্তান। দেশের সামগ্রিক চিত্রে এইসব স্কুল সংখ্যাতত্ত্বের বিচারে অনুল্লেখ্য। দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে আছে যেসব সরকারী-বেসরকারী মধ্যবিত্ত, নিম্নমধ্যবিত্ত ও গরীব স্কুলগুলি, তারাই আমাদের আলোচনার বিষয়। এই প্রস্তাবিত স্বাস্থ্যপ্রকল্প এদের সকলকে অন্তর্ভুক্ত করবে। কোন কোন ক্ষেত্রে স্বেচ্ছা প্রকল্পে কিছু কাজ হতে পারে, তবে ফলপ্রসূ হতে গেলে এই প্রকল্প সরকারী সাহায্যে এক জাতীয় প্রকল্প হিসেবে গ্রহণ করতে হবে।

উন্নত দেশের মডেল নির্বিচারে গ্রহণ করে জাতীয় জীবনের অন্যান্য প্রকল্পে আমাদের ঈপ্সিত লক্ষ্যে পৌছান যায় নি। তাই উন্নত দেশের স্কুল স্বাস্থ্য প্রকল্পকে আদর্শ হিসেবে না ধরে আমাদের দেশের স্কুলগামী ছেলে-মেয়েদের স্বাস্থ্য সমস্যা সম্পর্কে যতটুকু তথ্য পেতে পারি তা সংগ্রহ করে এবং বিভিন্ন অঞ্চলে কিছু কিছু নমুনা সমীক্ষা করে আমাদের প্রকল্পের রূপরেখা আমাদের তৈরী করতে হবে। পশ্চিমবঙ্গে সাতটি মেডিক্যাল কলেজ আছে এবং সেখানে আছে প্রিভেনটিভ্ ও সোশ্যাল মেডিসিনের পূর্ণাঙ্গ বিভাগ। প্রতি জেলায় আছে জনস্বাস্থ্য বিভাগ। এদের সহযোগিতায় পশ্চিমবঙ্গে স্কুল স্বাস্থ্য প্রকল্পের একটি রূপরেখা প্রস্তুত করা এবং আমাদের সীমিত সামর্থ্যের বিষয় বিবেচনায় রেখে প্রাথমিকভাবে কোন কোন বিষয়ের ওপর জোর দিতে হবে তা নির্ধারণ করা কি সত্যই এক অসম্ভব কাজ? আর এই প্রকল্পের অপর অংশ, স্বাস্থ্য শিক্ষণ, তো সরাসরি বাধ্যতামূলক স্কুল ক্যারি-কুলামের অঙ্গ হতে পারে। বর্তমানে Work-education বলে একটি উদ্ভট বিষয়, যার সম্পর্কে মজার মজার ঘটনা বন্ধুজনের কাছে শুনেছি, মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষনীয় বিষয় হিসেবে অন্তর্ভুক্ত আছে। এর পরিবর্তে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক স্বাস্থ্য শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। এই বিষয়টি অন্তত: Work-education-এর হাস্যকর নিষ্ফলতায় পর্যবসিত হবে না, কারণ এটি একটি জীবনমুখী ও সকলের দৈনন্দিন প্রয়োজনের বিষয়।

নমুনা সমীক্ষার বিষয়

স্কুলে ছাত্র ও শিক্ষকদের স্বাস্থ্য সমীক্ষা করতে খুব বেশী আয়াসের প্রয়োজন হবে না। ছাত্ররা, বিশেষতঃ প্রাথমিক পর্যায়ের ছাত্ররা, সাধারণ অপুষ্টি, চর্মরোগ, রক্তাল্পতা, বর্ধিত প্লীহা, দন্তরোগ ইত্যাদিতে বেশী ভোগে। স্কুল খাতায় ছাত্রদের নামের তালিকা, ছাত্র উপস্থিতি এবং অনুপস্থিতির কারণ ইত্যাদি সম্পর্কে একটি প্রয়োজনীয় সমীক্ষা করতে হবে। ছাত্রদের বিস্তৃত ডাক্তারী সমীক্ষায় থাকবে—অপুষ্টির প্রকৃতি এবং মাত্রা নিরূপণ, ত্বকের রোগ ও কানে পুঁজ পড়া ইত্যাদি সহজেই প্রতিবিধান সম্ভব এমন রোগ,

দীর্ঘস্থায়ী রোগ যথা পোলিও থেকে দৈহিক বিকৃতি, দৃষ্টিশক্তির ক্ষীণতা, দন্ত-রোগ, হার্নিয়া ইত্যাদি, টীকা ইত্যাদির চিহ্ন দেখে ও ইতিহাস নিয়ে পূর্বে প্রতিষেধ-ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে কি না তা জানা। কিছু ল্যাবরেটারী পরীক্ষা, যেমন রক্ত পরীক্ষা, কৃমি ইত্যাদির জন্য মল পরীক্ষা এবং ইদানীং ম্যালেরিয়ার জন্য রক্ত পরীক্ষা, করতে হবে নমুনা সমীক্ষায়। টিউবারক্যুলিন পরীক্ষা করে দেখা যাবে যক্ষার বিরুদ্ধে দেহ প্রতিরোধ শক্তি অর্জন করেছে কি না।

এই প্রাথমিক সমীক্ষায় বোঝা যাবে কোন কোন প্রাথমিক সমস্যার প্রতিবিধান করার চেষ্টা আগে করতে হবে। প্রায়শঃই এতে আসবে অপুষ্টি, চর্মরোগ, আন্ত্রিক রোগ, ম্যালেরিয়া এবং অঞ্চল বিশেষে কুষ্ঠ ইত্যাদি। আর একটি প্রয়োজনীয় সমীক্ষা করা যেতে পারে যাতে থাকবে বাড়ী থেকে কতটা যেতে হয় স্কুলে, কিভাবে যাতায়াত করা হয়, স্কুলের সময় অনুসারে বাড়ীতে খাদ্যগ্রহণ কিভাবে করা হয়।

শিক্ষকদের সাধারণ অবস্থা এবং ছাত্রদের প্রতি তাদের আচরণ ইত্যাদি সমীক্ষা করা যেতে পারে। স্কুল পরিবেশের সমীক্ষায় থাকবে পানীয় জলের ব্যবস্থা, পয়ঃ নিস্কাষণের ব্যবস্থা, সাধারণ পরিচ্ছন্নতা, স্কুলে ছাত্র ঘনত্ব, খেলা-ধূলোর ব্যবস্থা ইত্যাদি।

শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য দপ্তরে এই সব তথ্যাদি কিঞ্চিৎ মিলতে পারে, তবে পূর্ণচিত্র মিলবে স্কুলে স্কুলে সমীক্ষা করে, অন্ততঃ অঞ্চলভিত্তিতে কিছু প্রতি-নিধিত্বমূলক স্কুল বেছে নিয়ে সেখানে সমীক্ষা করে। এবং এইসব সমীক্ষাকে ভিত্তি করে রচিত হবে আমাদের স্কুল-স্বাস্থ্য ব্যবস্থা।

স্কুল-স্বাস্থ্য প্রকল্প কি রকম হবে

(ক) **স্বাস্থ্য ব্যবস্থা**

(1) **ছাত্রদের জন্য স্বাস্থ্য ব্যবস্থা**—ছাত্রদের রুটিনমাফিক স্বাস্থ্য পরীক্ষা ভর্তির সময় একবার এবং স্কুলত্যাগের সময় একবার করা হবে। অন্তর্বর্তী সময়ে বছরে একবার স্বাস্থ্যপরীক্ষার ব্যবস্থা সম্ভব হলে করা হবে। অভিভাবকদেরও এই স্বাস্থ্য পরীক্ষার সময় উপস্থিত থাকতে আমন্ত্রণ করা যেতে পারে।

প্রতিষেধকমূলক প্রাথমিক টীকা অবশ্য স্কুলে প্রবেশের আগেই নেওয়ার কথা। যেসব ছাত্র প্রাথমিক টীকা আগে নেয় নি তাদের জন্য প্রাথমিক টীকার ব্যবস্থা এবং যেসব টীকা একবারে দেওয়া চলে যেমন বি. সি. জি. সেগুলির ব্যবস্থা স্কুলে করা যেতে পারে।

স্কুলে প্রয়োজন মাফিক প্রাথমিক চিকিৎসার সরঞ্জাম রাখতে হবে। ছাত্র ও শিক্ষকদের সেগুলি ব্যবহারে এবং আকস্মিক অবস্থায় প্রাথমিক প্রতি-বিধানে সক্ষম হতে হবে। রোগের প্রধান লক্ষণগুলি সম্পর্কে শিক্ষকদের ওয়াকিফহাল থাকতে হবে এবং সন্দেহজনকক্ষেত্রে কোন ছাত্রকে বিস্তারিত পরীক্ষার জন্য স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পাঠাতে হবে।

(2) **শিক্ষকদের জন্য স্বাস্থ্য ব্যবস্থা**—স্কুল শিক্ষকদের স্বাস্থ্য ও চাকুরীর প্রারম্ভে এবং তৎপরে মাঝে মাঝে পরীক্ষা করতে হবে, বিশেষতঃ তাদের কোন সংক্রামক ব্যাধির সংক্রমণ ঘটেছে কি না তা দেখতে হবে, যেমন টি. বি. ইত্যাদি। শিক্ষক ও তার পরিবারবর্গের স্বাস্থ্য পরীক্ষা এবং কোন রোগ সংক্রমণের ক্ষেত্রে ত্বরিত চিকিৎসা শুধু তাদের স্বাস্থ্যই রক্ষা করবে না, ছাত্রদের নিরাপত্তাও সুচিত করবে।

(3) **স্কুল-পরিবেশের তত্ত্বাবধান**—স্কুলবাড়ীর অবস্থান ও নক্সা, সেখানকার জলসরবরাহ ব্যবস্থা, পয়ঃপ্রণালী, ক্লাসঘরের পরিসর ও ছাত্রদের বসার ব্যবস্থা, আলো ও আসবাবপত্রের যথাযথ বিন্যাস ইত্যাদি সম্পর্কে স্বাস্থ্য-কর্মীদের পরামর্শ নিতে হবে। খেলার মাঠ, কৃষি-উদ্যান, স্কুলে আহার প্রস্তুতির ব্যবস্থা ইত্যাদিও এই পর্যবেক্ষণে থাকবে। সম্প্রতি স্কুলে সরকার-আয়োজিত দ্বিপ্রাহরিক আহার সম্পর্কে অভিযোগ উঠেছে। স্কুলে আহার-প্রস্তুতি ও বণ্টন ছাত্র-শিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে করার ব্যবস্থা করলে এর সম্ভাব্য প্রতিবিধান হতে পারে। স্কুলের বহিঃপরিবেশ থেকে আকস্মিক বিপদ-আপদের সম্ভাব্য প্রতিষেধের দিকে সজাগ থাকতে হবে, যেমন ট্র্যাফিক দুর্ঘটনা, জলে ডোবা, সাপে কাটা ইত্যাদি। স্কুলচত্বরে একটি ছোটখাট ডিস্পেন্সারী থাকতে হবে।

(খ) **স্বাস্থ্য শিক্ষা**—আগেই বলা হয়েছে, স্বাস্থ্য শিক্ষাকে আবশ্যিক শিক্ষণীয় বিষয়রূপে গণ্য করতে হবে। সাম্প্রতিক এক তথ্যে প্রকাশ যে আমাদের দেশে প্রারম্ভিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে স্কুলত্যাগের একটা প্রধান কারণ, নীরস শিক্ষাক্রম, যা অনেক ছাত্রছাত্রীর কাছে আকর্ষণীয় মনে হয় না। অনেক উন্নতদেশে শিক্ষাক্রমকে ছাত্রছাত্রীর কাছে আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য বিশুদ্ধ তত্ত্বীয় শিক্ষার পরিমাণ কমিয়ে বিভিন্ন ব্যবহারিক বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে। স্কুল পর্যায়ে স্বাস্থ্য শিক্ষার অন্তর্ভুক্তি শিক্ষাক্রমকে ছাত্রছাত্রীদের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তুলতেও সাহায্য করবে।

স্বাস্থ্য শিক্ষা হবে তাত্ত্বিক এবং ব্যবহারিক। কোন পর্যায়ে কি কি শেখান হবে তা শিক্ষাবিদরা নির্ধারণ করবেন, তবে সামগ্রিক শিক্ষাক্রমে এই বিষয়-গুলি থাকা প্রয়োজন :—শারীর সংস্থান ও শারীরবিদ্যা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, প্রাথমিক চিকিৎসা, যৌন ও মানসিক স্বাস্থ্য, সিভিক্স, নেশা ও তার কুফল, ওষুধে আসক্তি ও তার ফলাফল এবং উঁচু শ্রেণীর ছাত্রীদের জন্য নার্সিং ও শিশুপালন। প্রয়োজনে এই তালিকার পরিবর্ধন বা পরিবর্জন করা যেতে পারে।

স্কুল-স্বাস্থ্য প্রকল্পের সংগঠন—সমাজের সর্বস্তরে বিজ্ঞান মানসিকতার প্রচার-প্রসারের জন্য বিজ্ঞান-আন্দোলন যেমন আঞ্চলিক স্কুলকে কেন্দ্রবিন্দু করে নিয়ে সুরু করতে হবে, জনস্বাস্থ্য প্রচেষ্টার একটি বৃহৎ ধারাও তেমনি সুরু হতে হবে স্কুল স্বাস্থ্য ব্যবস্থা তথা বিদ্যালয়স্তরে স্বাস্থ্য শিক্ষার সার্থক রূপায়ণ দিয়ে। যেমন মা ও শিশু প্রযত্ন (maternal and child welfare) প্রকল্পের আওতায় আমরা পাই জনগণের একটি বৃহৎ অংশকে, স্কুল স্বাস্থ্য প্রকল্পের মাধ্যমেও তেমনি আমরা পেতে পারি মোট জনসংখ্যার এক উল্লেখ্য

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী

অংশকে।

যে মন্ত্রকেরই অধীন হোক বা নূতন মন্ত্রক সৃষ্টি হোক, সমস্ত দেশকে স্পর্শ করতে হলে এই স্বাস্থ্য প্রকল্পের পরিচালক ও নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা সরকারকেই নিতে হবে। প্রথমে বিরাট আকারে না পারলেও, সীমিত সামর্থ্যের মধ্যে কোন কোন বিষয়গুলিকে অগ্রাধিকার দিতে হবে তা ঠিক করে নিতে হবে নমুনা সমীক্ষার ভিত্তিতে, যে সমীক্ষা করা আমাদের সাতটি মেডিক্যাল কলেজ ও জেলা স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষের পক্ষে বিরাট এক আয়াসসাধ্য ব্যাপার নয়। আর শিক্ষাক্রমের অন্তর্ভুক্ত করে স্বাস্থ্যবিধি শেখানও তো বিশাল খরচের অপেক্ষা রাখে না।

এই প্রকল্পের নেতার ভূমিকায় থাকবেন শিক্ষকেরা। স্কুল-স্বাস্থ্য প্রকল্প সম্পর্কে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক শিক্ষার ব্যবস্থা 'শিক্ষক-শিক্ষণ' কার্যক্রমে স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞের পরামর্শ অনুসারে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। স্বাস্থ্য কেন্দ্রের বা আঞ্চলিক ডাক্তারের সহযোগিতা প্রয়োজন হবে, তবে সে প্রয়োজন খুবই প্রান্তিক মাত্রার হবে। ডাক্তারের থেকে ঘনিষ্ঠভাবে এই প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত হতে হবে আঞ্চলিক সরকারী স্বাস্থ্যকেন্দ্রের নার্সকে। আঞ্চলিক কৃষিকর্মী, সমাজসেবক প্রভৃতিকেও এই প্রকল্পে যুক্ত করতে হবে।

এবং অবশ্যই সহযোগী থাকবেন অভিভাবকেরা। আজকাল শহরে ও গ্রামে মাতাপিতারা পুত্রকন্যার শিক্ষা সম্পর্কে বেশী বেশী সংখ্যায় ও মাত্রায় আগ্রহী হচ্ছেন। শহরে তো আকছার দেখা যায় মাতাপিতারা দৈনিক অক্লেশে শ্যামবাজার থেকে টালিগঞ্জ, গড়িয়া থেকে মধ্যকলকাতা পুত্র-কন্যার স্কুলে আসা-যাওয়া করেন, সপ্তাহান্তে ললিতকলা চর্চা করাতে পুত্রকন্যা নিয়ে ছোটেন বিভিন্ন সংস্থায়। এই অতিপ্রয়োজনীয় দিকটি সম্পর্কে তাঁরাও চিন্তা-ভাবনা সুরু করুন না!

আজকাল কম্যুনিটি মেডিসিন, কম্যুনিটি হেল্‌থ্‌ ওয়ার্কার ইত্যাদির কথা আমরা বলি। এটা প্রতিষ্ঠিত সত্য যে স্বাস্থ্যসম্বন্ধীয় অনেক কিছু ব্যবস্থা নিতে ডাক্তারের প্রয়োজন হয় না, কিছু ট্রেনিং থাকলে অ-ডাক্তার জনগণও এই ব্যবস্থাগুলি নিতে পারেন। যেখানে গ্রহণক্ষম বয়স ও মানসিকতার এক বড় জনসমষ্টিকে, যারা দেশের ভাবী নাগরিক, আমরা পাচ্ছি, সে পর্যায়টি ছাড়া অন্য কোন পর্যায়ে এই বিষয়গুলি সার্থকভাবে শেখান যেতে পারে?

আত্মবিশ্বাসী মানুষ সন্ধানে—

"Helping Health Workers Learn"

রবীন চক্রবর্তী

'হেল্‌পিং হেলথ ওয়ার্কার্স লার্ন'—একটি স্বাস্থ্য শিক্ষা ও শিক্ষণের বই। লিখেছেন ডেভিড ওয়ার্নার এবং বিল বাওয়ার। বইটির পরিধি কেবল স্বাস্থ্য শিক্ষার বিষয়ের মধ্যেই আবদ্ধ থাকেনি। —আরও বৃহৎ এবং মহত্তর কিছুর অনুসন্ধান করেছেন লেখকদ্বয়। প্রথম থেকে শেষ অবধি প্রতিটি ছত্রে একটি ভাবনাই প্রতিধ্বনিত হয়েছে—পৃথিবীব্যাপী অসংখ্য দরিদ্র ও উপেক্ষিত মানুষদের, চিন্তায় আচরণে এবং কাজে স্বনির্ভর ও আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠতে কিভাবে সাহায্য করা যায়।

একজন দু'জন নয়, বহু মানুষের দীর্ঘদিনের কাজের অভিজ্ঞতার সার সংকলন এই বই। বইটি সম্পর্কে বলার আগে পেছনের ইতিহাসটি সংক্ষেপে বলা প্রয়োজন। মধ্য আমেরিকার মেক্সিকো প্রদেশের পশ্চিমাঞ্চলে পাহাড়ী এলাকায় একটি গ্রাম—অজয়া। সতের বছর আগে এই গ্রামকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে একটি স্বাস্থ্য কেন্দ্র। এর মূলে ছিলেন একজন বিদেশী। নাম তাঁর ডেভিড ওয়ার্নার—এই বইয়ের লেখকদ্বয়ের একজন: পেশায় স্কুল শিক্ষক এবং নেশায় একজন প্রকৃতিবিদ্। একবার ঘুরতে ঘুরতে মেক্সিকোর এই পাহাড়ঘেরা এলাকায় এসে পড়েন। এখানকার পরিশ্রমী মানুষজন এবং তাদের অমায়িক বন্ধুসুলভ আচরণ তাঁকে মুগ্ধ করে। আবার ব্যথিতও করে এখানকার মানুষদের নিত্যকার রোগপীড়া এবং অপুষ্টির সমস্যা। তিনি চিকিৎসা বিদ্যার লোক ছিলেন না। তথাপি এখানকার মানুষজনদের দেখে তাঁর মনে হয় এদের উদ্যম এবং কর্মকুশলতার সাথে যদি বৈজ্ঞানিক চিন্তা-ভাবনার সংযোগ ঘটানো যায় তো এসমস্যার মোকাবিলা সম্ভব।

সেটি ছিল 1964 সাল। তিনি ফিরে এলেন দেশে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি হাসপাতালের এমার্জেন্সি বিভাগে কিছুদিন শিক্ষানবিশী করে ফিরে গেলেন মেক্সিকোর সেই গ্রামে। সাথে নিয়ে গেলেন নিজের হাতে আঁকা একরাশ পাখীর ছবি—উদ্দেশ্য, বিক্রি করে অর্থ সংগ্রহ করা। শুরু হল তাঁর মানুষের মধ্যে কাজ, মানুষকে নিয়ে কাজ। এদের সুখ-দুঃখের সাথী হয়ে নতুন ভাবে জানলেন মানুষ, সমাজ ও সামাজিক সম্পর্কগুলিকে। অপুষ্ট শিশু, রুগ্ন মাতা, মানসিক ভারসাম্য হারানো বিদ্রোহী কিশোর পুত্র, রোগজর্জর ক্ষেতমজুর পিতা, মান্ধাতার আমলের ভূমিসম্পর্ক—এক সুতোয় বাঁধা দেখলেন সব। প্রলেপ দেবেন কোথায়, ওষুধ দেবেন কাকে? তথাপি ধৈর্যের সাথে শুরু করলেন কাজ। আন্তরিক সহযোগিতা পেলেন স্থানীয় মানুষদের। নতুন-

ভাবে আবিস্কার করলেন মানুষের মধ্যে নিহিত উদ্ভাবনী ক্ষমতা। তাঁর ছোট্ট উদ্যোগ ক্রমে বড় আকার নিল। নাম হ'ল—Piaxtla Project। নিজেদের হাতে গড়া এই কেন্দ্রের প্রভাব অজয়া গ্রামের চৌহদ্দি ছাড়িয়ে চারপাশের একশটি গ্রামে বিস্তৃত হ'ল। ছিল স্বাস্থ্যকেন্দ্র—সাথে গড়ে উঠল স্বাস্থ্যকর্মী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রও। গড়ে উঠতে লাগল বিরাট সুনিপুণ কর্মীদল। শুরু হওয়ার দশ বছরের মধ্যেই পরিচালন ব্যাপারে গ্রামের মানুষ নিজেরাই দক্ষ এবং স্বয়ম্ভর হয়ে উঠল। এটিই ছিল ডেভিড ওয়ার্নারের স্বপ্ন। তিনি ধীরে ধীরে সরিয়ে নিলেন নিজেকে। কেন্দ্র চলতে লাগল আপন শক্তিতে।

ফিরে আসা যাক বইয়ের প্রসঙ্গে। দরিদ্র উপেক্ষিত মানুষের মধ্যে আত্মবিশ্বাস জাগাতে, তার মধ্যকার প্রভুত্বকামী প্রবৃত্তিগুলিকে চিহ্নিত ও নির্মূল করতে নানান পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর্বে উদ্ভাবিত নতুন নতুন অভিজ্ঞতা ও পদ্ধতি প্রকরণের সংকলন এই বই। এর মধ্যে কেবল মেক্সিকোর অজয়া গ্রামের অভিজ্ঞতাই নয়, পাঁচটি মহাদেশের পঁয়ত্রিশটি দেশের ছোটবড় অনুরূপ উদ্যোগের অভিজ্ঞতাও সংযোজিত এই বইয়ে। এক কথায় বইটি অনবদ্য। অবিশ্বাস্যরকম সহজ এবং সাধারণের উপযোগী করে লেখা।

এটি স্বাস্থ্যশিক্ষার বই—তবে প্রচলিত ধারার নয়। শুরুতেই একটি পাতায় শিরোনাম—'সাবধান'। সাবধান করে দেওয়া হয়েছে তাদের যারা প্রথাগত স্বাস্থ্যশিক্ষা বইয়ের অনুসারী বিষয় এখানে আশা করবেন। তারা হতাশ হবেন। প্রথম পাতাতেই একটি স্কেচ—দু'টি ছেলে একটি ব্যানার নিয়ে ছুটছে। তাতে লেখা—"To Learn is to change"—'শিক্ষা পরিবর্তনের জন্যই'। হতাশ হওয়ার আসল কারণ এখানেই। রাষ্ট্রীয় পরিচালনাধীন শিক্ষা ব্যবস্থার লক্ষ্য ঠিক এর বিপরীত। সেখানে প্রচলিত সমাজ কাঠামোটাকে টিকিয়ে রাখাই শিক্ষার উদ্দেশ্য। অথচ ঠিক উল্টোটাই বলা হয়েছে এই বইয়ে। উদ্দেশ্যটা চেপে ঢেকে বলা হয় নি—বলেছেন বেশ খোলসা করেই। একটি পাতায় ক্যাপশন—"why this book is so political"—'কেন বইটি এতটা রাজনীতি ঘেঁষা'।—কারণ বইটি লেখা হয়নি শহরের সৌখিন বিলাসবহুল জীবনযাপন করতে করতে, লেখা হয়েছে দীর্ঘদিন গ্রামের গরীব মানুষজনদের মধ্যে কাজ করার পরে। রোগ যন্ত্রণায় কষ্ট পাচ্ছেন গ্রামের দরিদ্র মানুষ, দেখে কষ্ট হয়েছে লেখকের। ভেবেছেন যদি সামান্যও সাহায্যে আসা যায়।—এই ছিল শুরুর উদ্দেশ্য। কিন্তু মানুষের সংস্পর্শে এসে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীটাই গেল বদ্‌লে। তাই অবশেষে রোগ-ভোগের পিছনে শুধু রোগ-জীবাণুই দেখলেন না, দেখলেন আরও কিছু। দেখলেন সামাজিক শোষণ-অবিচার-অত্যাচার। এরপর যে বই লেখা হয়েছে তা আর শিক্ষা জগতের প্রচলিত আদলে বাঁধা থাকেনি। বইটিতে একটি ইতালীয় বালকের উদ্‌ধৃতি আছে—"যারা আরাম ও সৌভাগ্যের প্রত্যাশী তারা রাজনীতি থেকে দূরেই থাকেন। তারা চাননা কোন কিছুর পরিবর্তন হোক"।

এর অর্থ এই নয় যে এটি নিছক একটি রাজনীতি পাঠের বই। আসলে

SCREENOGRAPHIC

SPECIALLY SILK SCREEN PRINTERS AND
GENERAL ORDER SUPPLIERS
ANY KINDS OF STICKER
LEVEL AND BRASS NAME PLATE

Vill. RAHUTA, P.O. SHYAMNAGAR
24 PARGANAS

PHONE : BHT 2687

স্বাস্থ্য শিক্ষা পরিবেশ যে প্রসঙ্গেরই অবতারণা করেছেন, তার গভীরে দেখেছেন সামাজিক অনৈক্যের প্রশ্নটি। এই অসংগতি মেনে না নিয়ে শিক্ষার পদ্ধতি ও উপকরণের মধ্য দিয়ে অন্তত শিক্ষার পরিধির মধ্যে একটি বিকল্প অবস্থান অর্জনের চেষ্টা করেছেন। এজন্য বেছে নিয়েছেন দৈনন্দিন জীবনের ক্ষেত্র। প্রাত্যহিক জীবনের আচার ব্যবহার কাজকর্ম সংস্কৃতি ক্ষেত্রের খুঁটিনাটি কোন অসংগতিই নজর এড়িয়ে যায়নি। আসলে তিনি শিক্ষাকে প্রচলিত ফ্রেমে বেঁধে দেখেননি। তাই খুব স্বাভাবিকভাবেই নিপীড়ণমূলক শিক্ষা, প্রভু-ভৃত্য সম্পর্কাশ্রয়ী শিক্ষা বা অন্ধ অনুকরণবাদী শিক্ষা সম্পর্কে সাবধানী ছিলেন সর্বদা। সচেতনভাবে চেষ্টা করেছেন এর বিকল্প দৃষ্টান্ত স্থাপনের।

বইটি পাঁচটি পর্বে বিভক্ত। যেমন—1) দৃষ্টিভঙ্গী এবং পরিকল্পনা; 2) পর্যবেক্ষণ, চিন্তা ভাবনা এবং কাজের মাধ্যমে শেখা; 3) "যেখানে কোন ডাক্তার নেই" (Where there is no Doctor)—এই বইটি ব্যবহার করতে শেখা; 4) মা এবং শিশুদের মধ্যে কাজ; 5) খাদ্য, জমি ও সামাজিক সমস্যার নিরিখে স্বাস্থ্য সমস্যার বিচার। প্রতি পর্বে রয়েছে বেশ কয়েকটি করে অধ্যায়। প্রতি পাতায় হাতে আঁকা ছবি অথবা ফটোগ্রাফ। প্রতি ছত্রে নতুন নতুন আইডিয়া। বইটির ভূমিকাতেই বলা হয়েছে—"এটি হচ্ছে নতুন নতুন ভাবনা ও উদাহরণ এবং অনেকের মিলিত অভিজ্ঞতা ও নির্ভীক মতামতের সংকলন, যা কল্পনাকে নাড়া দেয়;—যা আবিষ্কার আর দুঃসাহসিক অভিযানের প্রতি এক আহ্বান"। এতটুকু বাড়াবাড়ি নেই এই দাবীতে। যার প্রমাণ ছড়িয়ে রয়েছে এর অসংখ্য দৃষ্টান্তে, ছবি, স্কেচ, কার্টুন ও ক্যাপশনে।

বইটি সম্পর্কে সামান্য আভাস দিতে এর প্রথম পর্ব থেকে দু'একটি দৃষ্টান্ত ধরে আলোচনা করা যাক। অবশ্যি যে কোন পর্বের যে কোন অধ্যায় নিয়েই অনুরূপ আলোচনা করা যেত।...এই পর্বে প্রচলিত শিক্ষণ পদ্ধতির বিকল্প নিয়ে ভাবা হয়েছে। লেখকদের মতে 'কি বলা হবে'র চেয়ে 'কিভাবে বলা হবে' কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। যেমন, একটি স্কেচে দেখানো হয়েছে একজন সুবেশা মহিলা স্বাস্থ্যকর্মী গ্রামের কয়েকজন মায়েদের কিছু বোঝাচ্ছেন। হাতে তার একটি ফর্দ। তাতে কিছু উপদেশ লেখা। যেমন—ফোটানো জল খাওয়া, হাত-পা পরিষ্কার রাখা, পাকা পায়খানা ব্যবহার করা, জুতো পরা ইত্যাদি স্বাস্থ্য সম্মত অভ্যাস। মুখে বলছেন—'দেখুন, শিশুদের রোগপীড়ার জন্য আপনারাই দায়ী। দায়ী আপনাদের বদ অভ্যাস আর অজ্ঞতা' ইত্যাদি। ছবিতে দেখা যাচ্ছে মায়েরা খুবই বিমর্ষভাবে বসে আছেন। মোটেই ভাল লাগছে না এসব কথা। মহিলাটিকে খুবই অপছন্দ তাদের। বোঝাই যায় কেন এদের এই প্রতিক্রিয়া।

আর একটি স্কেচ—গ্রামের কিছু মহিলা বসে গল্প করছেন। তাদের আলোচনার বিষয় তাদের শিশুদের স্বাস্থ্য। প্রশ্ন উঠেছে তাদের কি কি অসুখ বেশী হয়, কখন বাড়ে, কেন বাড়ে ইত্যাদি। তারাই বলছেন, সর্দি পেট খারাপই বেশী হয়, হয় ফসল বোনার সময় যখন ঘরে খাবার রসদ আসে ফুরিয়ে, শিশুরা প্রায়ই অভুক্ত বা অর্দ্ধভুক্ত থাকে, দুর্বল হয়ে পড়ে, তখনই নানান অসুখ দেখা দেয়, ইত্যাদি। একের পর এক নিজেদের সমস্যার জট নিজেরাই খুলতে থাকেন। পরিবেশ খুবই ঘরোয়া। স্বাস্থ্য কর্মীটি এদের মধ্যেই আছেন—কিন্তু তাকে আলাদভাবে চেনা কষ্ট। এ দুটি উদাহরণ থেকে কোনটি শ্রেষ্ঠ পদ্ধতি, তা খুবই স্পষ্ট।

প্রচলিত শিক্ষা পদ্ধতির নির্মম সমালোচক লেখক। একটি স্কেচ—মাল বওয়ার একটি গাড়ী—ঘোড়ায় টানছে। গাড়ীর ওপর চাবুক হাতে চালক। গাড়ীর গায়ে লেখা—"Teaching Methods"—'শিক্ষা পদ্ধতি'। ঘোড়ার চোখ জোড়া আড়াল দেওয়া দু'টো ঢাকনা দিয়ে।—চালকের চোখেও অনুরূপ ঢাকনা। ডাইনে বাঁয়ে চাওয়া নয়, ঘোড়া ছুটছে। ছুটছে শিক্ষা।

আর একটি কার্টুন।—একটি রোগা পট্‌কা ছেলে উপুড় হয়ে শুয়ে রয়েছে—হাতে খোলা একখানা বই। প্যাণ্ট টাই পরা মোটা মত একটি লোক তার পিঠে বসা। মৌজ করে চুরুট টানছে সে। ছেলেটির প্রাণ যায় যায়। লোকটি বলছে—'বিপ্লবের বীর সৈনিকদের ওপর লেখা প্যাসেজটা আর একবার পড়তো, শুনি।—হ্যাঁ, বেশ আবেগ দিয়ে পড়ো'।

শিক্ষাপদ্ধতি, শিক্ষক, ছাত্র—এই নিয়ে শিক্ষা ব্যবস্থা। উপরে উল্লিখিত স্কেচ তিনটি এদের নিয়েই আঁকা। অনুমান করা শক্ত নয় লেখকের চোখে শিক্ষা ব্যবস্থার চেহারাটা কেমন। তাদের মতে বর্তমান স্কুল ব্যবস্থাটা হ'ল সামাজিক নিয়ন্ত্রণের প্রধান হাতিয়ার। পৃথিবীতে প্রায় কোন রাষ্ট্রই নেই

With best compliments from :

M/S. A. K. DEB & CO.

GOVT. CONTRACTORS

P.O. DIAMOND HARBOUR
24 PARGANAS.

যার শাসকরা দেশের অধিকাংশ মানুষের প্রতিনিধিত্ব করে। এরা যাদের প্রতিনিধি তারা হ'ল ব্যবসায়ী, ধনী জোতদার জমিদার, মিলিটারী, ডাক্তার, আইনজীবী ইত্যাদি। অতএব, এদের স্বার্থহানি হয় এমন শিক্ষা কখনই চাইবে না রাষ্ট্র। তাই শিক্ষার আদর্শ ই হ'ল—রাষ্ট্রের অনুগত ভৃত্য গড়া। শিক্ষক মশায়রাও নির্বিকারচিত্তে একই উপদেশ আউড়ে যান—"Listen & obey"—মন দিয়ে শোন আর বিনা প্রশ্নে আজ্ঞা বও। লেখকের মতে "এ ধরণের শিক্ষা আসলে কর্তৃত্ববাদী, কারণ এর উদ্দেশ্যই কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণ শক্তি-শালী করা। এই শিক্ষার লক্ষ্য হ'ল যা যেমন আছে তাই থাকুক, অর্থাৎ পরিবর্তনকে ঠেকানো"।

আর একটি ছবি—একজন শিক্ষকের হাতে একটি বাক্স। তাতে অনেক কাগজপত্র। বাক্সের গায়ে লেখা—'তথ্য, পরিসংখ্যান, নিয়মকানুন, আচরণ-বিধি'। সামনে একটি ছাত্রের মাথা ফুটো করে বসানো একটি কুপি (ফানেল)। শিক্ষকমশায় বাক্স উপুড় করে কাগজগুলো ঢালছেন ফানেলের মধ্যে। ছাত্রটি বলে চলেছে—'Yes, Sir. Thank you, Sir. That's right, Sir.

শিক্ষার এই কাঠামোটি বাতিল করার পক্ষপাতি লেখক। শিক্ষার বিভিন্ন ধাঁচ থেকে লেখক তিনটি মৌলিক ধারাকে চিহ্নিত করে তাদের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেছেন। যেমন,—

1) প্রথাগত ধারা :—যা চলছে তাকে মেনে নেওয়া অর্থাৎ পরিবর্তনকে ঠেকানো বা সামাজিক কাঠামোকে মজবুত করা।

2) প্রগতিশীল ধারা :—সংস্কারমূলক অর্থাৎ সমাজের চাহিদা অনুযায়ী মানুষকে পাল্টানো।

3) মুক্তিকামী ধারা :—পরিবর্তন অর্থাৎ জনগণের চাহিদা অনুযায়ী সমাজকে পাল্টানো।

লেখকদ্বয় তৃতীয় ধারার পক্ষপাতী। তারই আভাস বইটির প্রতিটি ছত্রে।

এরপর বিভিন্ন পর্বে এবং অধ্যায়ে আরও বহু বিষয়ের অবতারণা করা হয়েছে। সেখানে স্বাস্থ্যকর্মী নির্বাচন, কর্মসূচী নির্দ্ধারণ, আনন্দদায়ক শিক্ষা পদ্ধতির উদ্ভাবন থেকে শুরু করে প্রশিক্ষণের উপযোগী স্থান নির্বাচন, প্রশিক্ষণের কার্যকারিতা পরিমাপের মাপকাঠি বিষয়েও আলোচনা করা হয়েছে। প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয় চার্ট, মডেল, স্লাইড, কপি যন্ত্র, কিভাবে স্থানীয় মাল মশলায় তৈরী করা যাবে ছবি দিয়ে, দৃষ্টান্ত দিয়ে বোঝানো আছে। যদি গ্রামের মানুষদের ঘরে ঘরে গিয়ে তথ্য সংগ্রহ করতে হয় তাহলে কিভাবে পরিবেশকে ঘরোয়া করে নিয়ে এগুতে হবে বলা হয়েছে। কোন কোন বিষয় নাটক করে অভিনয় করে হাজির করলে সহজবোধ্য হয়—তার দৃষ্টান্ত দেওয়া আছে। পুতুল নাচের মাধ্যম শিক্ষাকে কতখানি হৃদয়গ্রাহী করা যায় তার বিবরণ দেওয়া আছে। অর্থাৎ মানুষের সাথে মানুষের ভাব আদান প্রদানের সম্ভাব্য সকল প্রক্রিয়ার ব্যবহার এনারা দেখিয়েছেন।

মোটকথা শিক্ষক, ছাত্র, সমাজকর্মী, শিল্পী সকলের জন্য উপযোগী বই এটি। এর সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ একটি লেখায় দেওয়া সম্ভব নয়। তবে ভবিষ্যতে বইটির বিষয়বস্তু থেকে কিছু কিছু উপকরণ এই পত্রিকার পাতায় পরিবেশনের ইচ্ছা রইলো। সবশেষে বইটির উৎসর্গের অংশটুকু উদ্ধৃত করি—

"এই বইটি অজয়া গ্রামের আর মেক্সিকোর সেই সমস্ত স্বাস্থ্যকর্মীদের
উৎসর্গ করছি যাদের কাছ থেকে এবং যাদের সঙ্গে নিরন্তর শিখে চলেছি…
আর তাদের প্রতিও এই বই উৎসর্গ করছি
যারা দুনিয়ার দরিদ্র মানুষের মাঝখানে কাজ করছেন।"

HELPING HEALTH WORKERS LEARN
—David Werner and Bill Bower
Published by : THE HESPERIAN FOUNDATION,
P.O. Box. 1692, Pal Atto, Ca 94302, U.S.A
নীচের ঠিকানায় লিখলেও ভি. পি.-তে বইটি পাওয়া যেতে পারে :
VOLUNTARY HEALTH ASSOCIATION OF INDIA (VHAI),
C-14 Community Centre,
Safdarjung Development Area ; NEW DELHI-110016
(Price Rs. 55/-)
লেখকের আগের বইটিও এই ঠিকানায় লিখলে পাওয়া যাবে। বইটির নাম—
'Where there is no Doctor' (Price Rs. 30/-)

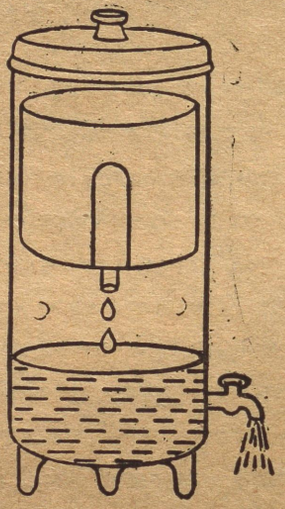

"শুভম্"
মৃত্তিকা ফিলটার
বিভিন্ন মাপের পাওয়া যায়

শুভম

মৃত্তিকা ওয়াটার ফিলটার
(সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে নির্ম্মিত)

প্রাপ্তিস্থান :—

রাহা এণ্টারপ্রাইজ

রাহা ভিলা, শুড়িপাড়া
নেতাজী সুভাষ রোড, (নতুন বাজার)
পোঃ চুঁচুড়া, জিলাঃ হুগলী

বিকল্প নোবেল পুরস্কার

গৌতম ব্যানার্জী

মানুষের সৃজনশীলতার স্বীকৃতি হিসাবে যে সম্মান আমরা দিয়ে থাকি তার চূড়ান্ত মাপকাঠি ধরা হয় নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তি। এটাও সেই সাথে ধরে নেওয়া হয় যে এইসব সৃজনশীল ক্রিয়াকলাপ মানুষের সুখশান্তি বাড়াবে। সেই উদ্দেশ্যে একটি নোবেল শান্তি পুরস্কারও দেওয়া হয়। কিন্তু আলফ্রেড নোবেল যে নৈতিক উদ্দেশ্য ও মনোভাব নিয়ে এই পুরস্কার দানের কথা চিন্তা করেছিলেন তা কি বর্তমানকালের পুরস্কার বিতরণের মধ্যে সার্থকতা লাভ করেছে? মানবসেবার এবং জীবনের মূল্যবোধের উৎকৃষ্ট নিদর্শন আমরা কতটা খুঁজে পাই এই পুরস্কারগুলির মধ্যে? শুধু জ্ঞানের জন্যই জ্ঞান আহরণের প্রয়াসের মধ্যে সমাজের প্রতি যে দায়িত্বহীন মনোভাব লুকিয়ে রয়েছে নোবেল পুরস্কারগুলি কি সেই মানসিকতাকে উৎসাহ দিচ্ছে না? এইসব প্রশ্ন তুলেছেন The Right Livelihood Foundation.

এই সংস্থাটি 1980 সালে লণ্ডনে স্থাপিত হয় Jacob von Uexkull নামে এক সুইডিশ ব্যক্তির উদ্যোগে। এই সংস্থা প্রতি বছর স্টকহল্‌মে "বিকল্প নোবেল পুরস্কার" দিয়ে থাকেন এবং এই পুরস্কার চালু হয় 1980 সাল থেকেই। এই সংস্থার ঠিকানা—Wybourn Drive, Onchan, Isle of Man, British Isles.

1980 সালে 50,000 ডলারের এই পুরস্কার পান হাসান ফাথি নামে এক মিশরীয় ভাস্কর, উদ্ভাবক, সঙ্গীতস্রষ্টা ও লেখক, আর স্টিফেন গ্যাসকিন—টেনেসির এক কৃষি জনসংস্থার প্রতিষ্ঠাতা, যা অহিংসা, আতিথেয়তা ও পারস্পরিক সহযোগিতার আদর্শে গঠিত।

অধ্যাপক ফাথি গত পঞ্চাশ বছর ধরে অক্লান্ত কাজ করে যাচ্ছেন কি করে প্রাচীন চিন্তা ও জ্ঞানকে বর্তমানকালে সংরক্ষিত করা যায় এবং কাজে লাগানো যায়। যেমন স্থানীয় সহজলভ্য উপকরণ থেকে বাড়ী তৈরীর প্রাচীন পদ্ধতিগুলি উনি আধুনিকীকরণের মাধ্যমে কাজে লাগিয়েছেন।

স্টিফেন গ্যাসকিন-এর কৃষিসংস্থা—"Plenty International" নামে একটি ত্রান সংগঠন চালু করেছেন যা অনুন্নত দেশে অনেক রকম গঠনমূলক কাজে ব্রতী হতে স্থানীয় লোকদের সামিল করেছে। যেমন, গুয়াতেমালায় সয়াবীন থেকে স্থানীয় খাদ্য তৈরী করার প্রকল্প, বাংলাদেশে সৌরশক্তিভিত্তিক বেতার যোগাযোগ, লেজথোয় (Lesotho) বনাঞ্চল গড়ে তোলা এবং বন সংরক্ষন, হাইতিতে উন্নততর কৃষিকার্য্য প্রচলন ইত্যাদি।

1981 সালে যে তিনজন এই পুরস্কার পেয়েছেন তাঁরা হলেন বৃটিশ ইঞ্জিনীয়ার মাইক কুলী, নির্বাসিত দক্ষিণ আফ্রিকার শিক্ষাবিদ প্যাট্রিক ভান রেন্‌সবার্গ, এবং অষ্ট্রেলিয়ান কৃষিবিদ বিল মলিসন।

মাইক কুলীকে British Lucas Aerospace Corporation থেকে বহিষ্কার করা হয়। তাঁর অপরাধ যে তিনি প্রায় দেড়শ'টার মতন শিল্পদ্রব্য ডিজাইন করে চালু করার চেষ্টা করেছিলেন যেগুলিকে গ্রহণ করলে লুকাস করপোরেশন যুদ্ধের জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী প্রস্তুত না করেও লাভজনক ব্যবসা করতে পারতো এবং সামাজিক প্রয়োজন মেটাতে পারতো। যে ধরণের সামগ্রী কুলী ডিজাইন করেছিলেন তার মধ্যে পড়ে Energy-Conserving products, Low-import technologies, Equipment for disabled, Artificial limb Control System, Sight-substituting aids ইত্যাদি। লুকাস কর্পোরেশন থেকে বহিষ্কারের পর উনি লণ্ডনে Centre for Alternative Industrial and Technological Systems নামে একটি সংস্থা তৈরী করে তাঁর নিজের চিন্তা এবং ইচ্ছাকে রূপায়িত করার চেষ্টা করছেন।

রেন্‌সবার্গ বিশ্বাস করেন যে শিক্ষা ও উৎপাদনের সুসমন্বয় সামাজিক পরিবর্তন ও উন্নতি সাধনের ভিত্তি, বিশেষ করে অনুন্নত দেশের পক্ষে। তিনি এই আদর্শে শিক্ষাবিস্তারের জন্য বৎসোয়ানা (Botswana) এবং জিম্বাবুয়েতে (Zimbabwe) বহু বছর ধরে অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছেন।

মলিসন কৃষিকার্য্যে "Permaculture" নামক নতুন ধরণের চিন্তাধারা প্রচলন করার চেষ্টা করছেন। Permaculture এমন একটি সামগ্রিক পরিকল্পনা যেখানে কৃষিকার্য্যের সাথে পরিবেশ সাম্যকে সমন্বিত করা হয়েছে।

সবশেষে প্রতিষ্ঠাতা Uexkull-এর মুখে "The Right Livlihood Foundation"-এর আদর্শ ও দর্শন সম্পর্কে কিছু মন্তব্য শোনা যাক।

"রাইট লাইভলিহুড কেবল একটা তত্ত্বগত নৈতিক আদর্শ নয়, এটা আমাদের সকলের কাছে পৃথিবী আর পরিবেশের ওপর আমাদের কাজের ফলাফলের ব্যক্তিগত দায়িত্ব গ্রহণের একটা আহ্বান, আর এমন একটা সমাজ গড়ার আহ্বান যেখানে এই দায়িত্ববোধ বাস্তবায়িত হ'তে পারে।

"রাইট লাইভলিহুড ফাউণ্ডেশন বিভাজন সৃষ্টিকারী, যান্ত্রিক জ্ঞানের বদলে সমন্বয়সৃষ্টিকারী, সামগ্রিক···জ্ঞানের প্রতি সমর্থন জানাচ্ছে।

"এই পুরস্কার সুন্দর সুন্দর তত্ত্ব আবিষ্কারের জন্য নয়। এটা সেই সব ব্যক্তিদের জন্য যাঁরা এই জ্ঞানকে তাঁদের দৈনন্দিন জীবনে দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন ব্যবহারিক কাজে লাগিয়েছেন।

"আমাদের এই পৃথিবীটাকে বদলাতে হ'লে শুধু আমাদের সাফল্যের মাপ-

কাঠিটাকে পাল্টালেই চলবে। উপলব্ধি আর আত্মিক বোধ যখন আমাদের সবচেয়ে কাম্য জিনিস হয়ে উঠবে, আমাদের সম্পত্তিগুলো যখন আমাদেরকে আর গ্রাস করে থাকবে না, তখন 'চিরন্তন অর্থনৈতিক নিয়ম'গুলো অপ্রয়োজনীয় কিছু রাশিসম্ভারে পরিণত হবে। সবচেয়ে বেশী মাত্রায় ভোগ আর উৎপাদন আমাদের প্রধান লক্ষ্য হওয়ার বদলে যখন প্রাকৃতিক সাম্য, ন্যায়-নীতি, আত্ম-নির্ভরতা, সহযোগিতা, আর সমন্বিত ও সামগ্রিক ব্যক্তিত্ব গঠনের আকাঙ্খা প্রাধান্য পাবে তখন, বস্তুতান্ত্রিকদের সমস্ত 'চিরন্তন নিয়ম' মধ্যযুগীয় যাজকদের যুক্তিহীন বিতর্কগুলির মতই অপ্রাসঙ্গিক হ'য়ে পড়বে।"

পরিক্রমা

নতুন ধরনের দুর্ঘটনা

এ বছর জানুয়ারী মাসে আকাশ থেকে ভেঙ্গে পড়ল কসমস-1402—পরমাণু শক্তি চালিত সোভিয়েত উপগ্রহ। সৌভাগ্যই বলতে হবে, বড় অংশটা পড়ল ভারত সাগরের বুকে। তবে শ্রীলঙ্কাতেও পড়ল কয়েকটা টুকরো। তেজস্ক্রিয় জ্বালানীর রডগুলো ঘুরতে থাকল পৃথিবীকে ঘিরে, এখানে ওখানে পড়তে থাকল পরের কয়েক মাস ধরে। কেউ জানতেই পারল না কতটা বিষ সঞ্চিত হ'ল কোন্ কোন্ জায়গায়। কতজনের কপালে লেখা হ'য়ে গেল মারাত্মক অসুখের বিধিলিপি।

পাঁচ বছর আগে 1978-এর জানুয়ারীতে যখন এরকমই আরেকটা উপগ্রহ কসমস-954 ভেঙে পড়েছিল কানাডায় তখনই মহাকাশবিজ্ঞানের অভিশাপের এই দিকটা অনেকের কাছে স্পষ্ট হয়েছিল। বোঝা গিয়েছিল যে বিজ্ঞানের এই 'জয়যাত্রা'কে শক্ত হাতে না রুখলে ক্রমশ বাড়তে থাকবে নতুন ধরনের এই দুর্ঘটনা। সোভিয়েত রাশিয়া থেকে তখন অবশ্য এইসব দুশ্চিন্তাকে অপপ্রচার আখ্যা দেওয়া হয়েছিল। বলা হয়েছিল একটা সামান্য দুর্ঘটনা, যা একান্তই আকস্মিক, তাকে নাকি চূড়ান্তরকম বাড়িয়ে দেখানো হচ্ছে। দুর্ঘটনার খবর রটার পর প্রথমেই রুশ সরকারী ঘোষণায় বলা হয়েছিল, কোনো বিপদের ভয় নেই, কারণ দুর্ঘটনা হলেই যাতে উপগ্রহগুলো মহাকাশেই ধ্বংস হয়ে ছড়িয়ে পড়তে পারে সে ব্যবস্থা করা আছে। তারপর যখন পৃথিবীর বুকে তেজস্ক্রিয় টুকরো পাওয়া গেল তখন সুর পালটে বলা হল, তেজস্ক্রিয়তার আশঙ্কা অত্যন্ত সীমিত। তাতেও যখন যথেষ্ট সমালোচনা হতে থাকল (মনে রাখতে হবে, কানাডা তৃতীয় বিশ্বের দেশ নয়) তখন সাময়িকভাবে ঐ জাতীয় উপগ্রহ ছাড়া বন্ধ করল সোভিয়েত রাশিয়া। কসমস উপগ্রহগুলোর কাজ হল মহাকাশ থেকে সামরিক গোয়েন্দাগিরি। বিশেষত সাগরের জাহাজ, ডুবোজাহাজ ইত্যাদির ওপর নজর রাখা। আকাশে ছাড়ার দুই একমাসের ভিতর এগুলির কর্মক্ষমতা শেষ হয়। ভিতরকার মালমশলাসহ তখন এগুলিকে একহাজার কিলোমিটার উঁচুতে পাঠিয়ে 'গুদামজাত' করা হয়। কসমস-1402 এরকমই একটা উপগ্রহ।

সামরিক গোয়েন্দাগিরির তাগিদ বড় জোরালো। 'সামান্য' কয়েকটা দুর্ঘটনা তার কাছে কিছু নয়। সব কাজেই দুর্ঘটনা আছে, দুর্ঘটনার ভয় করলে কোনো কাজই করা যায় না—এই বস্তাপচা যুক্তিটাও বেশ কাজ দেয়। বেশীদিন বন্ধ রইল না কসমস প্রকল্প। 1980-র এপ্রিলে রাশিয়া আবার ছাড়ল কসমস-1176। তিন বছর পর ভেঙে পড়ল কসমস-1402।

কসমস-954, স্কাইল্যাব, অথবা কসমস-1402-তে শেষ হবে না মহাকাশ দুর্ঘটনা, এবিষয়ে সন্দেহের বিন্দুমাত্র আজ আর অবশিষ্ট নেই। সামরিক গোয়েন্দাগিরির প্রলোভনে নেশাগ্রস্তের মত আকাশে উপগ্রহ পাঠিয়ে চলেছে আমেরিকা, রাশিয়া আর অন্যান্য বহু দেশ। উপগ্রহ পাঠাচ্ছে ভারতও। পরমাণু চুল্লী আর কৃত্রিম উপগ্রহ, এ দুটিকে মানবকল্যাণে আধুনিক বিজ্ঞানের বিরাট অবদান হিসেবে দেখা হয়। সাধারণ মানুষ আমরা জানতেই পারি না কত মারাত্মক হতে পারে এই অবদান।

অভিজিৎ লাহিড়ী

সরষের তেল ও হার্ট-ব্লক

খবরে প্রকাশ (স্টেট্‌সম্যান, 5 মার্চ 1983) যে ভারতের পূর্বাঞ্চলে, বিশেষত পশ্চিমবঙ্গে সরষের তেলের ব্যাপক ব্যবহারই নাকি এই প্রদেশের মানুষের হৃদযন্ত্র রুদ্ধ হবার (heart-block) অন্যতম প্রধান কারণ—এরকম একটি বক্তব্য রেখেছেন কলকাতারই ডাঃ সি সি কর, এখানে অনুষ্ঠিত সাম্প্রতিক এক হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ সম্মেলনে। ডাঃ কর তাঁর বক্তব্যের সপক্ষে যুক্তি-তথ্য দেখান যে ভারতে মোট 5000 পেস্-মেকার ব্যবহারকারীর মধ্যে 3800 জনই পশ্চিমবঙ্গের। সরষের তেলের অন্যতম প্রধান একটি অংশ হ'ল এরুসিক অ্যাসিড নামক অসম্পৃক্ত ফ্যাটি অ্যাসিড এবং মনুষ্যেতর প্রাণীর ক্ষেত্রে পরীক্ষা

করে দেখা গেছে যে এই অ্যাসিড হৃদযন্ত্রের মাস্‌ল্‌-এ জমা হয়। তিনি আরও বলেছেন যে 1979 সালে ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (ICMR)-কৃত এক পরীক্ষায় জানা গেছে যে হার্ট-ব্লকের ফলে মারা যাওয়া কলকাতার রোগীদের হৃদযন্ত্রে যেখানে গড়ে দশ শতাংশ এরুসিক অ্যাসিড বর্তমান, মাদ্রাজের রোগীদের হৃদযন্ত্রে কিন্তু এরুসিক অ্যাসিডের অস্তিত্ব ধরা পড়ে নি।

আমাদের পত্রিকার তরফে এসম্পর্কে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেমিক্যাল টেকনোলজি বিভাগের ভোজ্যতেল বিশেষজ্ঞ ডঃ দীপক ভট্টাচার্যকে প্রশ্ন করলে তিনি জানান, একথা ঠিক যে সরষের তেলে এরুসিক অ্যাসিড যথেষ্ট পরিমানেই আছে (মোট ফ্যাটি অ্যাসিডের প্রায় 48 শতাংশ) এবং একথাও ঠিক যে বিশেষত ইঁদুরের উপর পরীক্ষায় হৃদযন্ত্রের ক্রিয়ার উপর এর কুফল ধরা পড়েছে। কিন্তু এ থেকেই সিদ্ধান্ত করলে ভুল হবে যে মানুষের ক্ষেত্রেও হৃদযন্ত্র রুদ্ধ হবার এটাই কারণ। ডঃ ভট্টাচার্য 1980 সালে FAO প্রকাশিত একটি রিপোর্টের উল্লেখ করেন যাতে বলা হয়েছে: 'ভারতের যেসব অঞ্চলে বেশী এরুসিক অ্যাসিড যুক্ত অপরিশোধিত সরষে জাতীয় তেল ব্যবহার করা হয় সে সব অঞ্চলের মানুষের মধ্যে হৃদরোগের প্রকোপ বাদাম বা সিসেম জাতীয় তেল ব্যবহারকারী জনগোষ্ঠীর সঙ্গে অভিন্ন।' অবশ্য বাড়তি সাবধানতা হিসেবে FAO ভোজ্য তেলে এরুসিক অ্যাসিড কমাবার এবং / অথবা অন্য কম এরুসিক অ্যাসিড যুক্ত তেলের সঙ্গে মিশ্রিত করার সুপারিশ করেছেন (FAO Food & Nutrition Series No. 20 : Dietary Fats and Oils in human Nutrition) ।

ডঃ ভট্টাচার্য্য আরও বলেন যে উন্নত দেশগুলির তুলনায় আমাদের গড় দৈনিক তেলের ব্যবহার এত কম যে তা নিয়ে উদ্বেগের অবকাশ কম। তাছাড়া, এরুসিক অ্যাসিড মানুষের দ্বারা অপেক্ষাকৃত সহজেই পরিপাক হয় এবং সে কারণে হার্ট-মাস্‌ল্‌-এ এর জমা হওয়া শুধুমাত্র পরিমাণের উপরই নির্ভর করে না, আনুষঙ্গিক অন্যান্য খাবার, ব্যক্তির মানসিক ও দৈহিক অবস্থা ইত্যাদি অনেক কিছুর উপরই তা নির্ভরশীল। এসব কারণে সুনিয়ন্ত্রিত পরিবেশে সুপরিকল্পিত ভাবে মানুষের উপর পরীক্ষা চালিয়ে তবেই এসম্পর্কে সিদ্ধান্তে আসা উচিত। নানা কারণে এদেশে তেমন কোন পরীক্ষার কাজ প্রায় করাই হয়নি।

প্রসঙ্গত, ডঃ ভট্টাচার্য্য উল্লেখ করেন যে আমাদের দেশে ভোজ্য তেলের যথেষ্ট ঘাটতি রয়েছে। প্রচুর তেল আমদানী করতে হচ্ছে। অথচ আমরা সরষের তেলের চেয়ে ভাল বিকল্প ভোজ্য তেল (যেমন ধানের কুঁড়োর তেল, শাল-তেল ইত্যাদি) সহজেই পেতে পারি।

রবীন মজুমদার

কীটনাশক হইতে সাবধান

1972 সালে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের উদ্যোগে আয়োজিত মানব পরিবেশ সম্পর্কিত এক সম্মেলনের দশম বার্ষিকী উপলক্ষ্যে 16-টি দেশের বেশ কিছু সংখ্যক বেসরকারী সংগঠন একসঙ্গে ক্ষতিকারক কীটনাশকের যথেচ্ছ ও অপ-ব্যবহারের বিরুদ্ধে প্রচারে নামছেন এবং একটি কীটনাশক অ্যাকশন গ্রুপও গঠিত হয়েছে (স্টেট্‌সম্যান, 20 জুলাই, 1982)।

এই 16-টি দেশের মধ্যে কিন্তু ভারত নেই। অথচ এদেশে কীটনাশকের ব্যবহার সম্পর্কে যথেষ্ট উদ্বেগের কারণ আছে।

সাধারণভাবে বলতে গেলে, বহুল ব্যবহৃত কীটনাশকগুলির অনেকগুলিই দীর্ঘকাল ধরে বিষ হিসেবে সক্রিয় থাকে। উন্নত দেশগুলিতে পুরোপুরি নিষিদ্ধ বা ভীষণভাবে নিয়ন্ত্রিত কীটনাশকগুলি ভারতের বাজারে ক্রমশ বেশী বেশী করে জায়গা করে নিচ্ছে (বি-ও-বি, নভেঃ-ডিসেঃ 1978, জুলাই-আগস্ট ও সেপ্টেঃ-অক্টোঃ 1980 এবং মার্চ-এপ্রিল 1982 দ্রঃ)।

1950-এ মাত্র 25 টন ডি. ডি. টি. দিয়ে শুরু করে 1978-79-তে ভারতে কীটনাশকের ব্যবহার 56,000 টনে পৌঁছয় এবং এখন তা বার্ষিক 60,000 টন ছাড়িয়ে গেছে। এবং বেশ কয়েকটি বহুজাতিক সংস্থা সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় কীটনাশকের উৎপাদন ও ব্যবসায়ে জাঁকিয়ে বসেছে।

কলকাতার কেন্দ্রীয় খাদ্য পরীক্ষাগারে বিভিন্ন খাদ্য পরীক্ষা করে ধরা পড়েছে যে কলকাতা ও তার আশপাশ থেকে সংগ্রহ করা 820টি খাদ্যবস্তুর নমুনায় নানা বিষাক্ত কীটনাশক বর্তমান এবং তার মধ্যে আবার 215-টি ক্ষেত্রে এই পরিমাণ সর্বোচ্চ সীমারও উপরে অর্থাৎ সেগুলি মনুষ্যখাদ্য হিসেবে গণ্য হওয়া উচিত নয় (স্টেট্‌সম্যান, 14 জানুয়ারী, 1983)।

স্পষ্টতই এদেশের মানুষের অশিক্ষা আর অজ্ঞতার সুযোগ নিচ্ছে কিছু পুঁজিপতি-ব্যবসায়ী; সরকারও ইচ্ছা বা অনিচ্ছাকৃতভাবে (!) তাদের সহায়। একটু বেশী খবরাখবর যাঁরা রাখেন বা রাখতে পারেন সেই বুদ্ধিজীবি ও বিজ্ঞানকর্মীরাও নিশ্চুপ দর্শক।

1958 সালে বিষাক্ত কীটনাশকে কেরালায়—106 জনের মর্মান্তিক মৃত্যুতে যে বিতর্কের সূত্রপাত হয়েছিল 1968 সালের দি ইনসেক্টিসাইড্‌স্‌ অ্যাক্ট তারই ফলশ্রুতি। 1977-এ আইনটি সংশোধিতও হয়েছে। যদিও এই আইন যথেষ্ট ও উপযুক্ত নয়। তবুও এই আইনকেও কার্যকরী করার ব্যাপারে এপর্যন্ত প্রায় কিছুই করা হয়নি। "...(কীটনাশকের) আমদানী, উৎপাদন, বিক্রয়, পরিবহন, বণ্টন ও ব্যবহার নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে যাতে তা মানুষ বা প্রাণীর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ক্ষতির কারণ না হয়।..."আইনের এই বক্তব্য আজ উপহাসে পরিণত হয়েছে। তাছাড়া আইনে উল্লেখ থাকলেও আজ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় ও রাজ্যস্তরে কীটনাশক পরীক্ষাগার গড়ে তোলা এবং ইনস্পেক্টর নিয়োগ করা নিয়েও চলছে নিতান্ত গড়িমসি। এখনই সতর্ক না হ'লে আমাদের সামনে কিন্তু সমূহ বিপদ!

মণীন্দ্র নারায়ণ মজুমদার

প্রদীপের নীচেই অন্ধকার

27 ফেব্রুয়ারী কলকাতা উত্তাল হ'ল, ষ্টুডেন্টস্ হেলথ হোমের উদ্যোগে মিছিলে আওয়াজ উঠল 'সকলের জন্য পানীয় জলের সুব্যবস্থা চাই।' ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশনও 1982-92 দশকটিকে আন্তর্জাতিক জল ও নিকাশী দশক (Water and Sanitation Decade) হিসেবে ঘোষণা করেছেন। পানীয় জলের ব্যাপারে শহর কলকাতার অবস্থা কেমন, সে প্রশ্ন থাক। উচ্চতর বিজ্ঞান শিক্ষা ও গবেষণার অন্যতম প্রাণকেন্দ্র বিজ্ঞান কলেজের (রাজাবাজার) এর কথাই ধরা যাক। প্রতিদিন প্রায় হাজার দুই ছাত্র-শিক্ষক-গবেষক-কর্মী এখানে যাতায়াত করেন। ডজনখানেক বিভাগে কত না বিচিত্র ধারায় চলছে স্নাতকোত্তর পঠন-পাঠন ও গবেষণা। কিন্তু, অবিশ্বাস্য হ'লেও সত্যি, এখানে পানীয় জলের কোন ব্যবস্থাই প্রায় নেই। গ্রীষ্মকালে অবস্থাটা হয় আরও করুণ। প্রতিটি বিভাগে খোঁজ নিলে দেখা যাবে একাধিক 'ঠাণ্ডি-কল' অকেজো পড়ে আছে! নতুন একটি কল তিনমাসও সচল থাকতে চায় না। পরের বছর ওটাকে লোহালক্কড়ের দামে বেচে দিয়ে আবার নতুন একটি 'ঠাণ্ডি-কল' কিনতে হয়। বছরের পর বছর 'বিজ্ঞানের দৌলতে' চলছে এ ব্যবসা। এত টাকা বৃথা ব্যয় না করে একেবারে দেশী ফিল্টার যুক্ত কিছু বড় মাটির পাত্র বা নিদেনপক্ষে বালি-নুড়ি-কাঠকয়লা দিয়ে মাটির কলসী সাজিয়ে নেবার ব্যবস্থা করে নিলে কি অনেক সহজে অনেক ভাল পানীয় জল পাওয়া যেতো না?

* * *

কিছুদিন আগে যাদবপুরের কেন্দ্রীয় কাচ ও মৃৎশিল্প গবেষণাকেন্দ্রে একটি নতুন চুল্লী উদ্বোধন হ'ল রীতিমত পুজো অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। গৃহস্থের বাড়ী তৈরীর ক্ষেত্রে যেমন ভিত পুজো কি গৃহপ্রবেশ, কলে-কারখানায় যেমন বিশ্বকর্মাপুজো, স্কুলে স্কুলে যেমন সরস্বতী পুজো—এও তেমনি আর কি। শুধু কোন দেবতার উদ্দেশ্যে পুজো তা জানা যায় নি। একজন শুনে বললেন—ওটা ফার্নেস-পুজো। অত তাপমাত্রায় খাই খাই করে কাউকে খেয়ে না ফেলে, তাই পুজো করে সন্তুষ্ট রাখা, সে হিসেবে পুজো অগ্নিদেবতারই। আর একজন মন্তব্য করলেন, সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠান তো, মুসলমান কর্মীও নিশ্চয় আছেন, তাঁরা কেউ কোরাণ পাঠ করতে চাননি তো?

রবীন মজুমদার

খবর

গণতান্ত্রিক কনভেনশন

এদেশের অধিকাংশ বিজ্ঞানকর্মীই তাঁদের কাজের অবস্থা ও পরিবেশ সম্পর্কে বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েন অল্পদিনের মধ্যেই। কাজের বিষয়বস্তু নির্বাচন করার ব্যাপারই হোক আর পুরস্কার-তিরস্কার-শাস্তি ইত্যাদি বিতরণ করার ব্যাপারই হোক, প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের মোটা দাগের রাজনৈতিক বিচারবোধই চূড়ান্ত। দেশে এমন বেশ কিছু গবেষণা-প্রতিষ্ঠান আছে যেখানকার কর্মীদের কোন অধিকার নেই অবিচারের বিরুদ্ধে আদালতের শরণাপন্ন হবার; অধিকার নেই পরিচালন সমিতিতে নিজেদের কর্মী-প্রতিনিধি পাঠাবার। পশ্চিমবঙ্গে এসব দাবী নিয়ে আন্দোলন গড়ে উঠছে, দেশের অন্যান্য অংশেও তার প্রভাব পড়ছে। এ হেন সময়ে কেন্দ্রীয় সরকার "হাসপাতাল ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান (বিরোধ নিষ্পত্তি) বিল, 1982"—কে আইনে পরিণত করতে উদ্যত, যা বিভিন্ন হাসপাতাল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানে গণতান্ত্রিক সমস্ত অধিকারের উপর চরম আঘাত হানবে।

গত 16 ফেব্রুয়ারী কলকাতায় বেকার হলে জ্যাকারী (JACARI) সহ প্রায় পঞ্চাশটি সংগঠন এক 'গণতান্ত্রিক কনভেনশনে' এ বিলকে আইনে পরিণত করার প্রয়াসকে ধিক্কার দেন, আহ্বান জানান একে প্রতিরোধের।

দ্বিতীয় সারা ভারত গণবিজ্ঞান আন্দোলন সম্মেলন

গত 9 এবং 10 ফেব্রুয়ারী 1983, কেরালা শাস্ত্র সাহিত্য পরিষদের পরিচালনায় ত্রিবান্দ্রমে 'গণবিজ্ঞান আন্দোলন' বিষয়ে এক সর্বভারতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল। এর আগে গত 1978-এ এদেরই উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় প্রথম সর্বভারতীয় সম্মেলন।

বিভিন্ন রাজ্য থেকে শতাধিক প্রতিনিধি এই সম্মেলনে যোগ দেন। ভারতের বাইরে থাইল্যাণ্ড, ফিলিপাইন, শ্রীলঙ্কা থেকেও কয়েকজন প্রতিনিধি আসেন। 9 ফেব্রুয়ারী এই সম্মেলনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের পর দুপুর থেকে অংশগ্রহণকারী প্রতিনিধিদের মধ্যে আলোচনা শুরু হয়। পারস্পরিক পরিচিতি

পর্বের শেষে গণবিজ্ঞান আন্দোলনে সামিল বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিনিধিগণ তাদের কাজ এবং অভিজ্ঞতার বিবরণ দেন। আলোচনা আরও সুনির্দ্দিষ্ট এবং বিষয়নির্ভর করতে যোগদানকারী প্রতিনিধিবৃন্দ নিজের অভিজ্ঞতা ও রুচির ভিত্তিতে চারটি ভাগে বিভক্ত হয়ে ওইদিন সন্ধ্যা থেকে পরিবেশ, স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং কলা—এই চারটি বিষয়ে আলোচনা শুরু করেন। এই আলোচনা পরদিন দুপুর অবধি চলে। এই আলোচনার বিষয়বস্তু 10 তারিখের পূর্ণ অধিবেশনে পেশ করা হয়। ঠিক হয় গৃহীত সিদ্ধান্তগুলি লিখিত আকারে সমস্ত সংগঠনের কাছে পাঠানো হবে। এই প্রসঙ্গে আরও ঠিক হয় গণবিজ্ঞান আন্দোলন বিষয়ে একটি সর্বভারতীয় সংবাদ বুলেটিন নিয়মিতভাবে প্রকাশের চেষ্টা করা হবে।

এই সম্মেলনে যোগদানকারী সংগঠনের মধ্যে ছিল—কর্ণাটকের কর্ণাটক রাজ্য বিজ্ঞান পরিষদ, সায়ন্স সার্কেল, সমুদয়া; তামিলনাড়ুর পি. পি. এস. টি.; মহারাষ্ট্রের মেডিকো ফ্রেণ্ডস্ সার্কেল, ওয়ার্কার্স হেলথ্ সেফ্‌টি ইউনিট, লোকবিজ্ঞান সংগঠন; পশ্চিমবঙ্গের গোবরডাঙ্গা রেনেসাঁস ইনষ্টিটিউট, ইষ্টার্ন ইণ্ডিয়া সায়েন্স ক্লাব এ্যাসোসিয়েশন, কাঁচরাপাড়া বিজ্ঞান দরবার, ইত্যাদি। এছাড়াও আরও অনেক সংগঠন ছিল যাদের সকলের নাম এখানে দেওয়া সম্ভব হল না।

সুকুমার রায়

চতুর্থ সর্বভারতীয় বিজ্ঞান ক্লাব সম্মেলন

পূর্বভারত সায়েন্স ক্লাব অ্যাসোসিয়েশন (EISCA) আয়োজিত চতুর্থ সর্বভারতীয় বিজ্ঞান ক্লাব সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল কৃষ্ণনগরে 28 থেকে 30 ডিসেম্বর, 1982। এই সম্মেলন উপলক্ষ্যে পথ-পরিক্রমা, আলোচনা, বিতর্ক প্রতিযোগিতা ও বিজ্ঞান-প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়। "সরকার যেহেতু সমস্ত জনকল্যাণমূলক কাজের জন্য দায়বদ্ধ, বিজ্ঞান-ক্লাবগুলির এ বিষয়ে কিছু করণীয় নেই" শীর্ষক বিষয়ে বিতর্ক প্রতিযোগিতাটি বেশ শিক্ষাপ্রদ হয়েছিল।

সম্মেলনে প্রায় পঞ্চাশটি ক্লাবের প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। নামে সর্বভারতীয় হলেও কার্যত অন্যান্য প্রদেশের প্রতিনিধিত্ব প্রায় ছিল না। উদ্যোক্তাদের পক্ষে নানা ত্রুটিবিচ্যুতি অংশগ্রহণকারীদের উৎসাহ অনেকটা দমিয়ে দিয়েছে বলে অনেকের অভিযোগ। প্রথাবহির্ভূত বিজ্ঞান চর্চা ও একটি বৈজ্ঞানিক পরিমণ্ডল গড়ে তোলার ক্ষেত্রে EISCA-র পক্ষে আরও সুপরিকল্পিত কর্মসূচী নেবার অবকাশ আছে।

ডারউইন স্মরণ অনুষ্ঠান

নবদ্বীপের বিজ্ঞান চেতনা প্রসারে প্রস্তুতি সংগঠনের আহ্বায়ক পরিষদ গত 13 ফেব্রুয়ারী প্রকৃতি বিজ্ঞানী চার্লস ডারউইন স্মরণে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। নবদ্বীপ সাধারণ গ্রন্থাগারে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে আলোচনা, প্রবন্ধ ও বক্তৃতা প্রতিযোগিতা এবং বিজ্ঞান বিষয়ক পত্র-পত্রিকা ও পোষ্টার প্রদর্শনী অঙ্গীভূত ছিল। ডারউইনের জীবন ও কর্ম এবং বিজ্ঞান-চেতনা প্রসারে বিজ্ঞানকর্মীদের ভূমিকা বিষয়ে আলোচনা করেন যথাক্রমে অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ মান্না ও ডঃ অসিত সরকার।

এই অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে প্রচারিত একটি ঘোষণাপত্রে উদ্যোক্তাদের দৃষ্টিভঙ্গীর আভাষ মিলবে: "বিজ্ঞান তো আসলে একটা দৃষ্টিভঙ্গী—যা কিনা প্রকৃতিকে, সমাজকে, দেশকে, সর্বোপরি পৃথিবীকে সামগ্রিকভাবে দেখতে সাহায্য করে, প্রকৃতির রহস্যকে উদ্ঘাটন করে তার নিয়মগুলোকে ব্যবহারিক জীবনে প্রয়োগ করতে শেখায়। সেদিক থেকে প্রতিটি মানুষের জীবনেই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।"

গণবিজ্ঞানের লক্ষ্যে কর্ণাটক রাজ্য বিজ্ঞান পরিষদ

অন্যান্য ছোটখাটো দু-একটা সংগঠন বাদ দিলে কর্ণাটক রাজ্য বিজ্ঞান পরিষদই ঐ রাজ্যে একমাত্র সংগঠন, যা বিজ্ঞানকে সাধারণ মানুষের কাছাকাছি নিয়ে যাবার লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে। বহুলাংশে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতাতেই গড়ে ওঠা এই প্রতিষ্ঠানের শতাধিক শাখা (ইউনিট) রাজ্য জুড়ে গড়ে উঠেছে, যার মধ্যে প্রায় চল্লিশটি বেশ সক্রিয়। মূলত শাখাগুলির উদ্যোগে গড়ে ওঠা কয়েকটি স্থায়ী বিজ্ঞান প্রদর্শনী, মাসিক পত্রিকা 'বাল বিজ্ঞান' এবং সর্বসাধারণের জন্য প্রকাশিত কয়েকটি বিজ্ঞান-পুস্তিকা পরিষদকে গত কয়েক বছরে বেশ জনপ্রিয় করে তুলেছে। বর্তমান বছরে তিন লক্ষ টাকার সরকারী সাহায্য পরিষদের কাজকে সহজ করে তুলেছে। তবে তরুণ কর্মীর অভাবই এখন সবচেয়ে বড় বাধা হয়ে উঠেছে। এসব কথা জানা গেল কর্ণাটক রাজ্য বিজ্ঞান পরিষদের সহ-সভাপতি অধ্যাপক জে. আর. লক্ষ্মণরাও-এর মুখে, 8 মার্চ পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানকর্মী সংস্থা ও বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ আয়োজিত এক আলোচনাচক্রে।

পূর্ব ভারত বিজ্ঞান শিবির, 1983

বিড়লা ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল এ্যাণ্ড টেকনোলজিকাল মিউজিয়ামের (BITM) তত্ত্বাবধানে অন্যান্য বারের মত এবারেও কলকাতায় পূর্ব ভারত বিজ্ঞান শিবির অনুষ্ঠিত হল (26 ফেব্রুয়ারী থেকে 5 মার্চ)। ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ সায়েন্স মিউজিয়াম, পশ্চিমবঙ্গ সহ অন্যান্য পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলির শিক্ষাদপ্তর এবং পশ্চিমবঙ্গের যুব দপ্তর এই শিবিরের উদ্যোক্তা। আসাম বাদে অন্যান্য 7টি পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যের স্কুল এবং বিজ্ঞান ক্লাবগুলি থেকে প্রায় 250 প্রতিযোগী এবং প্রায় দেড়শ বাছাই করা প্রজেক্ট এই শিবিরে অংশগ্রহণ করে। মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পাঠক্রমের ছাত্রছাত্রীরা এই শিবিরে অংশগ্রহণের অধিকারী।

সপ্তাহব্যাপী এই বিজ্ঞান শিবিরের ক'দিন বিড়লা মিউজিয়াম চত্বর ছিল উৎসব মুখর। প্রদর্শনী দেখতে এসেছিলেন প্রায় সতের হাজার দর্শক। প্রদর্শনী ছাড়াও বক্তৃতা, আলোচনাচক্র, বিজ্ঞান চলচ্চিত্র ইত্যাদির ব্যবস্থা ছিল। প্রদর্শনীতে পঃ বঙ্গের প্রতিযোগীর সংখ্যা ছিল বেশী। পশ্চিমবঙ্গের তাঁবুগুলি ছিল জেলাওয়ারি। তুলনায় অন্যান্য রাজ্যের জেলা-ভিত্তিক আলাদা তাঁবু ছিল না এবং প্রজেক্ট ছিল সীমিত সংখ্যক।

পশ্চিমবঙ্গের বাইরের অন্যান্য রাজ্যের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে কিন্তু তাদের স্থানীয় সমস্যা, সম্ভাবনা ও চাহিদাকে বিশ্লেষণ করে প্রজেক্ট তৈরীর প্রবণতা অনেক বেশী। যেমন নাগাল্যাণ্ডের অংশগ্রহণকারীরা তাদের মডেলে নাগাল্যাণ্ডের গ্রাম ও পরিবেশের প্রতিচ্ছবি তুলে ধরার চেষ্টা করেছে এবং সেই ভিত্তিতে স্থানীয় শিল্প-সমস্যার দিকে তাকিয়ে আবর্জনা পুনর্ব্যবহারের প্রজেক্ট, রেশম রীল তৈরীর যন্ত্র, তুলো বাছাই-এর যন্ত্র, ইত্যাদি হস্ত-শিল্প উপযোগী মডেল তৈরী করেছে। মনিপুরের জনৈক প্রতিযোগী তৈরী করেছে করেছে 'গোবর বার্নার'। আমাদের গ্রাম-মফস্বলের জীবনে ঘুঁটে-কয়লার উনান এবং ধোঁয়া এক প্রাত্যহিক বিড়ম্বনা। জানা গেল, শুধু গোবর নয়, ধানের কুঁড়ো, অন্যান্য শষ্যের খোসা বা অন্য যে কোন আবর্জনাকে নির্ধূম উপায়ে জ্বালিয়ে সম্পূর্ণ তাপ ধারক পদ্ধতিতে রান্না করার এই বিশেষ বার্নারটি তৈরী করতে খরচ পড়বে পঞ্চাশ-ষাট টাকা। এতে কয়লা ব্যবহার না করলেও চলবে। ব্যবহারিক উপযোগিতার দিক থেকে এই মডেলটি এবার পুরস্কৃত হয়েছে। এছাড়া দলগত বিভাগেও মনিপুর পুরস্কার পেয়েছে। উড়িষ্যার একজন ছাত্র যুব সাধারণ উপাদানে 'পায়ে চালানো ধান ঝাড়াই কল' তৈরী করেছে। বিহারের বেগুসরাই অযোধ্যা স্কুলের ছাত্র তৈরী করেছে 'প্যাতি-প্রসেসর'। পঃ বঙ্গের মুর্শিদাবাদের স্বরূপপুর হাই স্কুলের ছাত্রের তৈরী একটি হস্তচালিত মডেল-যন্ত্র একই সাথে চেরাই, ড্রিলিং ইত্যাদির সঙ্গে কাজ চালানোর উপযোগী বৈদ্যুতিক আলো উৎপাদনে সক্ষম। নিঃসন্দেহে গ্রামীন কুটীর ও ছোট শিল্পের দিকে তাকিয়ে মডেলটি তৈরী। কিন্তু মডেলটির যান্ত্রিক জটিলতা হয়ত গ্রাম-জীবনে এর ব্যবহারযোগ্যতাকে সীমিত করবে। মডেলটি অবশ্য এবারের শিবিরে প্রথম পুরস্কার পেয়েছে। এছাড়া অন্যান্য ব্যবহারিক মডেলের মধ্যে ছিল একাধিক বায়ু-চালিত জলোত্তলক, গ্রামীন ইনকিউবেটর, ইত্যাদি।

বৃহৎ ও মাঝারি শিল্প-উৎপাদন ব্যবস্থা ব্যাখ্যা করার উপযোগী কিছু প্রজেক্ট এই শিবিরে ছিল; যেমন, রবার শিল্প বা মোম ও গ্রীজ উৎপাদন শিল্প। কিছু শিক্ষামূলক প্রজেক্ট ছিল, যার মধ্যে অনেকগুলি পরিবেশ দূষণ বিষয়ক, কয়েকটি গাণিতিক বা গণিত-সহায়ক। হুগলীর একটি ছাত্র তাপ-নিউক্লীয় বৈদ্যুতিক চুল্লীর মডেল তৈরী করেছে। যদিও বোঝাবার সময়ে ভারতে প্রযুক্তিগত স্বয়ম্ভরতা, অর্থনৈতিক অবস্থা, পারমাণবিক দূষণ, পরমাণু অস্ত্র তৈরীর সম্ভাবনা ইত্যাদির সঙ্গে তাপ-নিউক্লীয় চুল্লীর সম্পর্ক আলোচিত হয় নি। যেমন, 'কৃত্রিম উপগ্রহ মাধ্যমে যোগাযোগ ব্যবস্থা' বিষয়ে একটি প্রজেক্ট প্রদর্শিত হলেও আলোচনার সময়ে ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থাগত পরিপ্রেক্ষিত, সামরিক প্রয়োজনে কৃত্রিম উপগ্রহের ভূমিকা ইত্যাদি বিষয়গুলি অনুল্লেখিত থেকেছে। দমদমের বিজ্ঞান ক্লাবের পক্ষ থেকে এসেছিল মশা সংক্রান্ত একটি বিশাল গবেষণামূলক প্রজেক্ট। এই শিবিরে সব থেকে পীড়া দিয়েছে কিছু অর্থহীন বা উদ্দেশ্যহীন মডেল। যেমন, টেবিলের ওপর একটি পুতুল রোবট অকারণ শুধুই হেঁটে যায়। কোরাপুটের একটি বিজ্ঞান ক্লাবের সদস্য তৈরী করেছে বৈদ্যুতিক স্বয়ংক্রিয় মুড়ি ভাজা যন্ত্র! অটোমেশন-এর নেশা আর কি। কলকাতার একটি বিলিতি স্কুলের দু-জন ছাত্রী 'যান্ত্রিক রন্ধন সহায়ক' তৈরী করেছে, 'মডার্ন-টাইম্‌স্'-এর কারখানায় চ্যাপলিনকে খাওয়ানোর যন্ত্রটির মতো!

এত জাঁকজমক এবং উচ্চাকাঙ্খা সত্বেও মডেল বা প্রজেক্টগুলি দেখলে সামগ্রিকভাবে প্রদর্শনীটি সম্পর্কে হতাশ হতে হয়। কয়েকটি বাদে অধিকাংশ প্রজেক্টই মামুলী। ব্যবহারিক উদ্দেশ্য নিয়ে যেসব মডেল তৈরী করা হয়েছে সেগুলির বেশীর ভাগই গতানুগতিক বার্গলার এলার্ম, ফায়ার এলার্ম ইত্যাদি। বেশ অনুভব করা যায় যে, সামগ্রিকভাবে (বিশেষতঃ পঃ বঙ্গের) ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সমাজ ও পরিবেশকে বিজ্ঞানসম্মতভাবে বুঝে তদনুযায়ী প্রজেক্ট উদ্ভাবনের প্রচেষ্টা প্রায় অনুপস্থিত। যদিও এই সমস্ত প্রজেক্ট কিছু ব্যতিক্রম বাদে সাধারণভাবে ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষক-শিক্ষিকা, কখনও অভিভাবকদের, বুদ্ধি, সহযোগিতা ও নির্দেশে নির্মিত হয়। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে সমাজ-নির্ভর জীবনমুখী বিজ্ঞান চর্চার কোন সুযোগই নেই এবং শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ এই ব্যবস্থারই অঙ্গ বিশেষ। আর তাই শিক্ষা ব্যবস্থার দৈন্যই এই বিজ্ঞান শিবিরে প্রতিফলিত হতে দেখা যায়। প্রকৃতপক্ষে, বছরে একবার করে জেলা স্তর থেকে জাতীয় স্তরে নির্বাচিত প্রজেক্ট নিয়ে বিজ্ঞান শিবির করলেই দেশের ছাত্রছাত্রীরা বিজ্ঞানমুখী হয়ে উঠবে না। সত্যিই যদি ছাত্রছাত্রীদের বিজ্ঞানমুখী করে তোলার সদিচ্ছা থাকে তবে প্রথাগত ও অপ্রথাগত ভাবে বিজ্ঞানচর্চার এক বহুমুখী পরিকল্পনা রূপায়িত করতে হয়।

ধ্রুবজ্যোতি দে

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী

পুস্তক পর্যালোচনা

"রোগ ও তার প্রতিষেধ"—সুখময় ভট্টাচার্য, পঃ বঃ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, পৃ. 94, দাম 5 টাকা।

সাম্প্রতিকতমকালে প্রকাশিত এ ধরণের বইগুলির মধ্যে এই বইটি বেশ উল্লেখ করার মত। কেননা খুব সাধারণ কতকগুলি রোগের প্রতিকার নয়, প্রতিষেধ নিয়ে এতে আলোচনা করা হয়েছে। বিষয় নির্বাচনে, উত্থাপনায়, লেখন ভঙ্গীতে, বোধগম্য ভাষা ব্যবহারের দিক থেকে বইটি বেশ বৈশিষ্ট্যপূর্ণও। বিষয়বস্তু অযথা ভারাক্রান্ত নয় বলেও খানিকটা, আবার বক্তব্য খুব পরিমাপমত বলেও খানিকটা চট্ করে বইটিতে চোখ বুলিয়ে নেবার প্রবণতা জাগায়।

তবু খুব খুঁটিনাটি দু'একটি অনবধানতা রয়ে গেছে। সামনের প্রচ্ছদের রঙ বৈচিত্র্য খুব সুন্দর। কিন্তু শিশুর ছবিটি প্রথম দর্শনে ভ্রম জাগায়, মনে হয় ভেতরের বিষয়বস্তু বুঝিবা পুরোপুরি শিশুস্বাস্থ্য সম্বন্ধীয়।

মা ও শিশুর প্রযত্ন অংশটি বইয়ে থাকা খুব দরকার কিন্তু রোগ ও প্রতিষেধের সঙ্গে এই অংশটিকে পারম্পর্য ও সামঞ্জস্য রেখে এক সারিতে আনা হয়নি।

'ওষুধের ব্যবহার ও ইয়োট্রোজেনিক ব্যাধি' শীর্ষক অধ্যায়টি গুরুত্বপূর্ণ। —বিশেষকরে আধুনিক চিকিৎসার সুযোগ যাদের কাছে বিস্তৃত তাদের জন্য। বিজ্ঞাপনের উপর নির্ভর করে ওষুধের যথেচ্ছ ব্যবহার বেড়েই চলেছে। —এমন অবস্থায় ওষুধও যে বিপদ ডেকে আনতে পারে সেদিকে খেয়াল রাখা দরকার। এর প্রতিষেধক পন্থা হিসেবে লেখক কয়েকটি পরামর্শ রেখেছেন। এর সাথে ওষুধ ব্যবহারকারীদের 'নিজেরাই ডাক্তারী করার' প্রবণতা কমানোর পরামর্শটাও রাখলে ভাল হতো মনে হয়। 'সভ্যতার মাশুল ও করোনারী থ্রম্বসিস' অধ্যায়ে প্রতিষেধের উপায় হিসেবে কতগুলি পালনীয় কর্তব্যের মধ্যে কোলেষ্টেরল কমায় এমন জিনিষ খাদ্যের তালিকার অন্তর্ভুক্ত করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। সেখানে পেঁয়াজের সাথে রসুনের উল্লেখ করা যেতো। 'ক্যানসার কি ও কেন'—এই অধ্যায়ে প্রতিষেধের পর্বে অন্যান্য বিষয়ের সাথে রঙীন খাবার যেমন ঠাণ্ডা পানীয়, আইসক্রীম, কুলপি, লজেন্স, মিষ্টি ইত্যাদি বিষয়ে কিছু সাবধানবাণী থাকা দরকার ছিল।

ভাষা ব্যবহারে লেখক যথেষ্ট যত্নবান হলেও দু'একটি জায়গায় একটু সহজ সমার্থক প্রতিশব্দ দিলে ভাল হতো (যেমন পৃঃ 24 পুষ্টির ব্যত্যয়, পৃঃ 39 সন্ধিপদ বাহিত, পৃঃ 73 স্যাচুরেটেড ও আনস্যাচুরেটেড ফ্যাট)।

এ বইতে ছাপার ভুল থাকা উচিত ছিলনা কিন্তু বাংলা ভাষার বই-এর এই ত্রুটি থেকে এ বইটিও মুক্ত নয়।

এসব সত্ত্বেও বলা যায় যে, যে উদ্দেশ্যে বইটি লেখা এবং যাদের কথা মনে রেখে লেখা, সেই বিচারে বইটি সঠিকভাবেই এবং গ্রহণযোগ্য করেই পরিবেশন করা হয়েছে। এরকম একটি ছোট্ট, সহজ বই বাংলায় লেখার জন্য পাঠকের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ।

অনুরাধা বিশ্বাস

চিঠিপত্র

★ আমার গ্রাম অজয় নদীর 1½-2 কিমিঃ উত্তরে এবং গ্রামের ½ কিমিঃ দক্ষিণে কাসানদী (কথিত আছে এটা আগে অজয়ের গতিপথ ছিল— বর্ত্তমানে অজয় দক্ষিণে সরে গিয়েছে) মাটির জলের Drain হিসাবে কাজ করে। আমাদের এখানে অজয় নদের ধার বারবার ঢালো shallow বহু আছে— এবং জল ভালো পাওয়া যায়। water layer 30 ft. থেকে 60-70 ft.-এর মধ্যে। আবার আমাদের গ্রামের উত্তরে সমস্ত বলে যে গ্রাম আছে ওখানেও খুব ভালো Shallow আছে—এবারে প্রায় 60/70টি Shallow এসেছে॥ water layer 50 ft.—100 ft. মতো। আমাদের গ্রামে দক্ষিণ মাঠে বর্ত্তমানে 5টি Shallow হয়েছে—কিন্তু জল খুব ভালো উঠছে না। water layer 56 ফুটের পর 24 ফুট॥ কিন্তু আমার ওখানে কোথাও layer পাই নাই। কেবল এক জায়গায় 100 ফুটের পর 8 ফুট layer ছিল—কিন্তু মিস্ত্রিদের মতে ঐ layer একটি shallow কে জল যোগান দিতে পারবে না। তাই আমি এখন ভাবছি। সে নিম্নলিখিত উপায়ে কিছু করা যায় কিনা—এবং এ ব্যাপারে আপনারা আমাকে সাহায্য করতে পারেন কিনা বা কার কাছে বা কোথায় সাহায্য পেতে পারি।

1) 150-300 fit-এর মধ্যে যদি layer পাই তবে তাতে shallow বা semi Deep tube well করা যায় কিনা? 2) যদি সম্ভব হয় কত ইঞ্চি dia pipe দিতে হবে এবং minimum কত ft. stainer লাগবে। 3) ঐ ক্ষেত্রে কত H.P.-এর pump machine লাগাতে হবে। মোটামুটি কত খরচ পড়বে। 4) আমাদের এখানে 150 থেকে 300 ft. মধ্যে water layer আছে কিনা বা কতটা আছে বা জল কেমন তা বৈদ্যুতিক রোধ বা শাব্দিক সন্ধান দ্বারা করা যাবে কিনা? এটা করতে হলে আপনারা বা কে বা কোথায় যোগাযোগ করতে হবে? এ ব্যাপারে আমাদের গ্রামের আরও interested ব্যক্তি পাওয়া যাবে। কত খরচ পড়বে?

—দেবরঞ্জন সাঁই

★ 'বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী'র স্বল্পদিনের গ্রাহক হওয়া সত্ত্বেও এর বৈশিষ্ট্য আমাকে চমৎকৃত করেছে। এখন হাটেবাজারে বিজ্ঞান পত্রিকার অভাব নেই; তার মধ্যে কিছু বৃহৎ পুঁজিপতি গোষ্ঠি পরিচালিত,—সেগুলিতে বিজ্ঞান-সংবাদ পরিবেশনের আপাত নির্লিপ্ত আবরণে ধর্ষণের উপর প্রবন্ধ থাকে, কৈশোরের জটিলতার উপর উপযুক্ত ছবি বা ড্রইং সহ ব্যাখ্যা থাকে। নিশ্চয়ই সেগুলো জ্ঞানের খবর। কিন্তু 'বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী'র প্রচেষ্টা ভিন্ন, যেহেতু তার উদ্দেশ্য ভিন্ন। বি ও বি সমাজবিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে বিজ্ঞানকে দেখছে, আমাদের আর্থসামাজিক পটভূমিতে বিজ্ঞানের আবিষ্কার উদ্ভাবনের সঙ্গতি অসঙ্গতির কথা বলছে। এই পত্রিকার পৃষ্ঠা-স্পর্শে মসৃনতার আরাম নেই, বিজ্ঞান জগতের ম্যাটিনি আইডলের রচনা নেই, সবই সত্যি। কিন্তু কিছু লোক তো জানতে চায়, বিজ্ঞানের অগ্রগতির সাথে সমানুপাতিক হারে বর্দ্ধিত অসংখ্যের অভাববোধের কেন বিন্দুমাত্রও নিরশন হচ্ছে না, অথচ কতিপয়ের হচ্ছে। ইত্যাকার সংবাদ ও বিশ্লেষণে এক বিশেষ ধরণের আন্দোলনের পথিকৃত হিসাবে 'বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী' অনেকের প্রিয়জন।

—মহঃ খলিল

আসুন এগিয়ে চলি

'নবম এশিয়ান গেম্‌স্‌-এর আয়োজক দেশ হিসেবে আমাদের সাফল্যের জন্যে ভারত সমগ্র বিশ্বের কাছ থেকে অভিনন্দন লাভ করেছে।

স্টেডিয়ামগুলি রেকর্ড সময়ে তৈরী করা হয়েছে। সারা দেশে এবং বিদেশে লক্ষ লক্ষ মানুষ রঙীন টেলিভিশনে সরাসরি খেলা দেখেছেন। এই বিশাল কর্মযজ্ঞে কমপিউটার, ইলেকট্রনিক এক্সচেঞ্জ, মাইক্রোওয়েভ এবং উপগ্রহ সংযোগকে সুষ্ঠু ও দক্ষভাবে কাজে লাগানো হয়েছে।

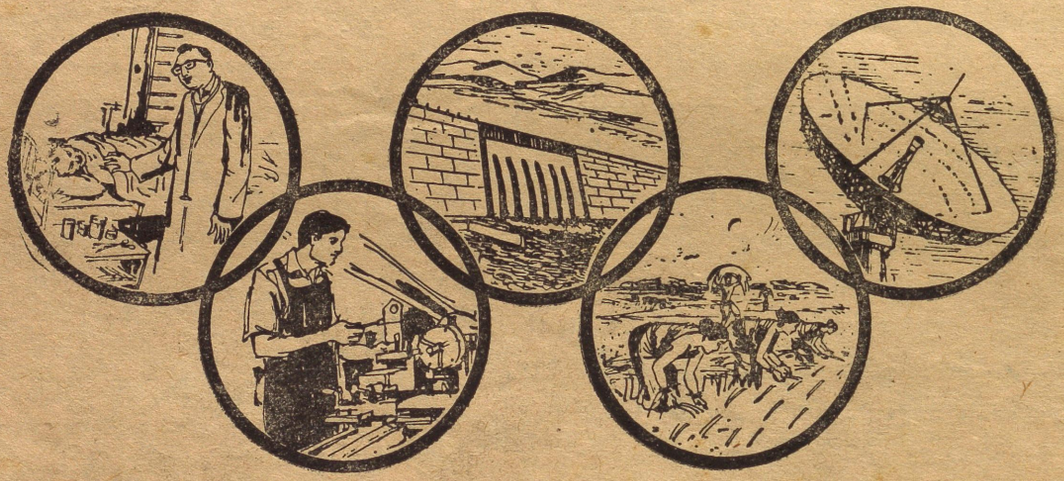

সংঘবদ্ধ প্রয়াস এবং কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে যে সাফল্য অর্জন করা সম্ভব এটি তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

আমরা যদি এই মনোভাব নিয়ে কাজ করি তবে জাতীয় উন্নয়নের অন্যান্য ক্ষেত্রেও অনুরূপ সাফল্য অর্জন করা সম্ভব।

শক্তিশালী দেশ গঠনে
আসুন আমরা সকলে মিলেমিশে কাজ করি

davp 82/552

"দারিদ্র্য দৃর করার যাদুমন্ত্র একটিই
আর তা হলো নির্দিষ্ট লক্ষ্যের সুস্পষ্ট
ধারণা নিয়ে শৃংখলাবোধের সঙ্গে
কঠোর পরিশ্রম করা।"

—ইন্দিরা গান্ধী

সত্যমেব জয়তে—শ্রমেব জয়তে

davp 82/500

ঘো ষ ণা

জনবিজ্ঞান ও জনস্বাস্থ্য তথ্যকেন্দ্র

বিগত কয়েক বছর ধরে জনবিজ্ঞান ও বিকল্প স্বাস্থ্য ব্যবস্থা নিয়ে ভাবনা চিন্তা শুরু হয়েছে। কিছু কাজও করা হচ্ছে। কিন্তু এ ধরণের কাজ করতে গিয়ে কর্মীরা সবচেয়ে বড় অসুবিধা যেটার সম্মুখীন হন সেটা হল এই বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্যের অভাব। তথ্য যতটা পাওয়া যায় সেটাও রয়েছে ছড়িয়ে ছিটিয়ে। বিভিন্ন কর্মীগোষ্ঠী ও সংস্থা বেশ কিছুদিন ধরে আলাপ আলোচনা করে জনবিজ্ঞান ও জনস্বাস্থ্যের একটি তথ্যকেন্দ্র (Documentation Centre) স্থাপনের উদ্যোগ নিয়েছেন। তথ্যকেন্দ্রগুলি আপাতত সাময়িক ভাবে প্রসেনজিৎ জনস্বাস্থ্যকেন্দ্রে স্থাপিত হবে। তথ্যকেন্দ্রটিতে জনবিজ্ঞান ও জনস্বাস্থ্য সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি (বই, সাময়িকপত্র, সংবাদপত্রের অংশ ইত্যাদি) রাখা হবে। আগ্রহী কর্মীরা একদিকে যেমন সংশ্লিষ্ট বিষয়ের তথ্যাদি সংগ্রহ করতে পারবেন। অন্যদিকে পরস্পর আলোচনা ও মতবিনিময় করে প্রত্যেকের কাজের পরিধিকে বাড়িয়ে বিজ্ঞান ও স্বাস্থ্যকে অধিকতর জনমুখী করে তুলতে প্রয়াসী হবেন বলে আশা করা হচ্ছে। দেশের বিভিন্ন অংশে জনবিজ্ঞান ও জনস্বাস্থ্য আন্দোলনের সাথে যুক্ত কর্মী ও সংস্থাগুলির কাছে আমাদের আবেদন আপনারা সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলির উপর প্রয়োজনীয় তথ্যাদি পাঠিয়ে কাজকর্মে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে মতামত দিয়ে নব গঠিত তথ্যকেন্দ্রটি স্থাপনের প্রয়াসকে সাফল্যমণ্ডিত করে তুলুন—

ডাঃ স্মরজিৎ জানা
আহ্বায়ক, জনবিজ্ঞান ও জনস্বাস্থ্য তথ্যকেন্দ্রের
প্রস্তুতি কমিটি

যোগাযোগ :—

প্রসেনজিৎ স্মৃতি জনস্বাস্থ্য কেন্দ্র
11E, হেমচন্দ্র নস্কর রোড, কলিকাতা-10
(সন্ধ্যা 5টা থেকে রাত 10)

ভ্রাম্যমান বিজ্ঞান প্রদর্শনী ও অনুষ্ঠান
—উদ্যোগী গণবিজ্ঞান সমন্বয় কেন্দ্র

আগামী মে মাসের 4 তারিখ থেকে সাত দিন একটি বিজ্ঞান মিছিল কিছু প্রদর্শনী ও অনুষ্ঠান সহযোগে মেদিনীপুর জেলার কয়েকটি অঞ্চল পরিক্রমা করবে। এতে থাকবে পথনাটিকা, সঙ্গীত, পোষ্টার, স্লাইড ও ম্যাজিক প্রদর্শনী, বক্তৃতা ইত্যাদি। সম্ভাব্য যাত্রাপথ হল—খড়্গপুর, ঝাড়গ্রাম, লোধামুলি, গোপীবল্লভপুর, নয়াগ্রাম, রায়বেরা, এগরা, পটাশপুর, ভগবানপুর, সবং, বালিচক, খড়্গপুর। পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানকর্মী সংস্থা এই উদ্যোগে সহযোগী। আপনারাও সক্রিয়ভাবে অংশ নিন—চাইছি। আপনারা কি ধরণের অনুষ্ঠান করতে পারেন জানান।

অনুষ্ঠানের ব্যয় উৎসাহী বন্ধুদের আর্থিক অনুদানের উপর নির্ভর। সাধ্যমত কিছু সাহায্য পাঠান।

যোগাযোগের ঠিকানা :— অভিজিৎ লাহিড়ী, EC 160, সল্ট লেক, কলকাতা-700064

সন্তোষ ঘোরাই / যোগেন দেবনাথ, বার্জ টাউন, মেদিনীপুর-721101

বিশ্বপ্রিয় মুখার্জী, কলা বিভাগ, আই আই টি, খড়্গপুর-721 302

উৎস মানুষ, বি ডি 494, সল্ট লেক, কলকাতা-700 064

সম্পাদকমণ্ডলীর পক্ষে রবীন মজুমদার কর্তৃক সম্পাদিত, প্রকাশিত এবং ইটারনিটি প্রিন্টার্স, 8, ডঃ আশুতোষ শাস্ত্রী রোড, কলিকাতা-700010 হইতে মুদ্রিত।